—সচিত্র নূতন সংস্করণ—

কল্পনা দেবী

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

দাম—এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীবিভূতি ভূষণ কয়োড়ী
"কয়োড়ী প্রেস"
৩নং মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

উপহার

....

....

....

কল্পনা দেবী

—এক—

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন জন্মেছিলেন এ-যুগে বটে কিন্তু তাঁর মনটা বাঁধা ছিল সে-যুগের খোঁটায়। আধুনিক আবহাওয়ার ঝড়-ঝাপ্‌টা যতবার তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেচে ততবারই তিনি দ্বিগুণ বেগে সে-যুগের খোঁটার মূলে ফিরে এসেচেন।

ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ী কলকাতার কাছাকাছি কোনো একটা শহরে। কলকাতার লোক এখন সে জায়গাকে শহর বল্‌বে না বটে কিন্তু কলকাতা যখন শহর হয়নি তখন এ স্থানকে লোকে বড় শহর বল্‌ত। কলকাতারই শহরত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে এ স্থান গ্রাম্যদোষে দুষ্ট হোয়ে উঠেচে।

ন্যায়রত্ন মশায়ের শ্বশুরবাড়ীর হালচাল ছিল কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীর একেবারে উল্‌টো। তাঁরা কলকাতাবাসী; সবেমাত্র সে-কালের দড়ি ছিঁড়েছেন; সদ্য দড়ি-ছেঁড়া গাভীর মতন গতি তাঁদের তখন উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল। বৈবাহিক বাড়ীর হালচাল দেখে ন্যায়রত্নের পিতা শিরোমণি মশায় শঙ্কিত হলেন। তাই মরবার আগে তাঁদের খোঁটাটির ভিত যাতে আরও বনিয়াদী হয় তার ব্যবস্থায় মন দিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি দীনবন্ধুকে বলে গেলেন—ছেলেদের ইংরেজী লেখাপড়া কখনো শিখিও না।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের বাড়ীতে টোল ছিল। পিতার আশীর্ব্বাদে অবস্থাও ছিল বেশ সচ্ছল। মৃত্যুশয্যায় বাবার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ছেলেদের ইংরেজী বিদ্যা শেখাবেন না।

পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে দীনবন্ধুর বংশধর এল। তাঁর স্ত্রী বিমলা দেবী তখন গৃহকর্ত্রী। তিনি বল্লেন—ছেলের নাম রাখো অমর।

স্ত্রীর কথা শুনে নৈয়ায়িক দীনবন্ধু একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লেন। তিনি স্ত্রীকে বোঝাতে লাগলেন—মনুষ্যজীবনে মৃত্যুই একমাত্র সত্য। তোমার ছেলে দেবতা নয়, কাজেই অমর নাম তার কিছুতেই হোতে পারে না।

বিমলা দেবী বল্লেন—তোমার ও-সব ন্যায়শাস্ত্রের কথা রেখে দাও। ছেলের আমার একশো বছর পরমায়ু হোক—

বিমলা দেবীর কঠিন কণ্ঠস্বর হঠাৎ নরম হোয়ে গলে একেবারে অশ্রুতে পরিণত হোলো। কিন্তু দীনবন্ধুর মগজের ন্যায়ের মৌচাকে তখন খোঁচা পড়েচে, গৃহিণীর অশ্রু তাঁর যুক্তিকে ভাসাতে পারলো না। তিনি বল্লেন—আহা একশো কেন, পাঁচশো বছরই যদি পরমায়ু হয় তা হোলেও তো অমর হওয়া যায় না।

অনেক তর্কাতর্কি ও অশ্রু অনুনয়ের পর দুই তরফে রফা হোলো ছেলের নাম হবে অজর।

অজর বড় হোতে লাগ্‌ল। পাঁচ বছর বয়সে সমারোহ কোরে তার হাতে-খড়ি হোলো। বছর দুয়েক পরে দিন-ক্ষণ দেখে একদিন ন্যায়রত্ন ছেলেকে সংস্কৃত অক্ষর পরিচয় করাতে আরম্ভ কোরে দিলেন।

স্বামীর কাণ্ড দেখে বিমলা দেবী বল্লেন—ছেলে যে বুড়ো হোতে চল্‌ল, ওকে ইস্কুলে দেবে কবে?

ন্যায়রত্ন বল্লেন—ইস্কুলে তো দেব না।

বিমলা দেবী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—ওমা ইস্কুলে দেবে না কি গো?

ন্যায়রত্ন বল্লেন—আমাদের কেউ কখনো ইস্কুলে যায়নি। অজরকে

চাকরী কোরে খেতে হবে না। মিছিমিছি ইস্কুলে ইংরেজী শিখে কতকগুলো বদ অভ্যাস হবে।

বিমলা দেবী সেদিন আর স্বামীর সঙ্গে তর্ক করলেন না। রাত্রিবেলা সংসারের কাজ শেষ কোরে শোবার সময় ঘুমন্ত অজরের কপালে একটি চুমু খেয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুমের আগে কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাঁর বালিশে গড়িয়ে পড়্‌ল।

ইংরেজী না শিখলেও অজর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতে যেতে লাগ্‌ল। তারপর মাঠ থেকে বাড়ীতে ফিরে যখন সে মাকে বল্‌ত—জান মা, আজ বাঁশতলা স্পোর্টিংকে তিনটি গোলে হারিয়ে আমরা 'সেমি-ফাইনালে' উঠলুম। যোগেশ যদি 'ড্রিবলিং' ছেড়ে দিয়ে ভাল করে 'সুট' করতে শেখে তা হোলে আমাদের 'ক্লাবের ফরোয়ার্ড'দের আটকাতে পারে এমন 'ডিফেন্‌স' কোনো ক্লাবেরই নেই—ইত্যাদি—তখন বিমলা দেবীর বুক গর্ব্বে ফুলে উঠ্‌ত। তিনি মনে করতেন, তাঁর মেধাবী ছেলে এমনি কোরে দু-একটা কথা শিখতে-শিখতেই ইংরেজীতে পরিপক্ক হোয়ে উঠবে। একদিন উৎসাহের মুখে তিনি স্বামীকে বলে ফেল্লেন—তুমি তো ছেলেকে ইস্কুলে দিলে না কিন্তু ও দিব্যি ইংরেজী কথা শিখ্‌চে।

ন্যায়রত্ন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তখুনি অজরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ফুটবল কি?

তারপর যখন বুঝতে পারলেন যে, লাথি খাওয়াই হচ্ছে সে জিনিষটীর ধর্ম্ম এবং তাঁর পুত্র সেই ইংরেজী বস্তুটীকে লাথাতে ওস্তাদ হোয়ে উঠেচে তখন তিনি মনে-মনে খুশীই হলেন।

ন্যায়রত্ন কখনো কলকাতায় যেতে চাইতেন না। তিনি বলতেন যে, ও-বাড়ীর সদর দরজার দরোয়ান থেকে আরম্ভ কোরে ভেতর বাড়ীর

পাকশালার পাচক ঠাকুর পর্য্যন্ত কেউ শুচিতা রক্ষা কোরে চলে না। স্বামী না গেলেও বিমলা দেবী কিন্তু নিয়ম কোরে মাসের মধ্যে একবার বাপের বাড়ী যেতেন এবং প্রতিবারই অজর তাঁর সঙ্গে থাকৃত। এ সম্বন্ধে স্বামীর কোনো রকম ওজর-আপত্তি তিনি শুনতেন না।

একদিন খেতে বসে অজর তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ মা, বড় মামীর মতন তুমি কাট্‌লেট্ বানাতে পার না?

ন্যায়রত্ন পাশেই খেতে বসেছিলেন। তিনি চম্‌কে উঠলেন—কাট্‌লেট্ কি?

ফুটবলের বৃত্তান্ত শুনে তিনি যেমন খুশী হয়েছিলেন কাট্‌লেটের ইতিহাস শুনে তেমনি দমে গিয়ে অজরকে সাবধান কোরে দিলেন—ভবিষ্যতে ও-সব ম্লেচ্ছ জিনিষ আর খেও না।

অজর মেধাবী ছেলে। পিতার শিক্ষার গুণে দিনে দিনে সে সংস্কৃতে পণ্ডিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তার যখন বছর ষোলো বয়স সেই সময় বিমলা দেবী ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

মার মৃত্যুর পর মামার বাড়ীর সঙ্গে অজরেব সম্পর্ক প্রায় রহিত হোয়ে গেল। পিতার সনাতনী শাসনের তলে সে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলে।

কয়েকটা বছর এই ভাবে কেটে গেল। অজর যৌবনে পদার্পণ করলে। ন্যায়রত্ন তার বিয়ের যোগাড় করচেন এমন সময়ে তাঁরও ডাক পড়্‌ল। নিজের হাতে মানুষ-করা পণ্ডিত ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে তিনিও সনাতন স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

পিতার মৃত্যুর পর অজর দেখলে সংসারে তার নিজের বলতে কেউ নেই। মামার বাড়ীর সঙ্গে বহুদিন কোনো সম্পর্ক নেই। তার বাবা একেই তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসেন না। মাতামহ ও

মাতামহী যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁরা তবু তাঁর খোঁজ নিতেন। তাঁদের মৃত্যুর পর মামারা আর তার খোঁজও রাখে না।

ছেলেবেলার বন্ধু যারা তাদের অধিকাংশই এখন নানাকাজে কলকাতায় বাস করে, দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক উঠে গিয়েছে বল্লেই হয়।

অজরের বিষয়-আশয় ছিল। খাওয়া-পরার তার কোনো কষ্টই নেই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারলে, শুধু খেয়ে-পরে জীবনধারণ করা চলে না। মাঝে-মাঝে তার মনে হোতে লাগ্‌ল যে, দেশ ছেড়ে গিয়ে কলকাতায় থাক্‌লে কেমন হয়! কিন্তু সেখানে গিয়ে সে কোথায় থাকবে! সেইখানেই বা বন্ধু-বান্ধব, সমাজ পাবে কোথায়! এই সব নানা চিন্তায় পড়ে তার যাওয়া হচ্ছিল না, এমন সময় অভাবনীয়রূপে তার কলকাতায় যাওয়ার একটা সুযোগ জুটে গেল।

সে সময় মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচন নিয়ে অজরদের ছোট্ট শহরখানা টলমল করছিল।

একদিন অজর সকালবেলা তার ফুলবাগানের তদারক কর্‌চে এমন সময় একদল যুবক হৈ হৈ কোরে তাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়্‌ল। ছেলেরা চেঁচাতে লাগ্‌ল—অজর-দা আছ?—অজর দা কোথায় গেলে গো—

অজর তাড়াতাড়ি এসে দেখলে যে, লাইব্রেরীর ছেলেরা ঘোষবাবুদের সুনির্ম্মলকে নিয়ে এসে হাজির হয়েচে। সুনির্ম্মল অজরের ছেলেবেলার বন্ধু! এখানকার ইস্কুলের পড়া শেষ কোরে সে কলকাতায় পড়্‌তে গিয়েছিল। সেই থেকেই সে এক রকম দেশ-ছাড়া। সুনির্ম্মলের বাবা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। এখন সে এম এ, বি এল পাশ কোরে বাবার সঙ্গে বেরুতে আরম্ভ করেচে।

সুনির্ম্মল বল্লে—তোমার কাছে এসেচি ভাই, ভোটের জন্য। এবার আমি দাঁড়িয়েছি কিনা—

অজয় বল্লে—বেশ বেশ, তোমরা দেশের দিকে একটু মন দিলে দেশের কত উন্নতি হয়। তা তোমরা এখন হয়েচ কলকাতার বাবু।

সুনির্ম্মল বল্লে—কলকাতার বাবু না হয়ে কি করি বল! তোমার মতন খাবার-পরবার ভাবনা না থাকলে দেশেই থাকতুম। এখানে থাকলে তো আর অন্ন জুটবে না।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুনির্ম্মল বল্লে—অজয়, আজ সন্ধ্যাবেলা ভাই আমার ওখানে খাবে।

অজয় কোনো কথা না বলে চুপ কোরে রইল। তাকে চুপ কোরে থাকতে দেখে সুনির্ম্মল বল্লে—কি, আমাদের ওখানে খেতে তোমার আপত্তি আছে নাকি?

সুনির্ম্মলের এই প্রশ্নে অজয়ের মনে কি জানি ছেলেবেলা মামার বাড়ীর সেই কাটলেট খাওয়ার কথা মনে পড়্‌ল। সে বল্লে—না, আপত্তি আবার কিসের?

সুনির্ম্মল বল্লে—তবে ঐ কথা রইল। সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয় যাবে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অজয়ের সঙ্গে সুনির্ম্মলের অনেক কথা হোলো। কথায়-কথায় অজয় সুনির্ম্মলকে গিয়ে জানালে যে, কলকাতায় গিয়ে থাকবার তার খুবই ইচ্ছা। একটা কাজ-কর্ম্ম সেখানে পেলে সে এখুনি চলে যায়।

সুনির্ম্মল অজয়কে আশ্বাস দিয়ে বল্লে—কোনো চিন্তা নেই, আমি বাবাকে বলে তোমার একটা ব্যবস্থা কোরে দেবই।

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে অজয় সুনির্ম্মলের কাছ থেকে চিঠি পেলে—পত্র-পাঠ চলে আসবে, কাজের যোগাড় হয়েচে।

সেই-দিনই সন্ধ্যাবেলায় অজয় সুনির্ম্মলদের কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হোলো। চাকরী তার ঠিক হোয়ে গিয়েচে। শহরের একটা

মেয়ে-কলেজে পণ্ডিতের কাজ। সুনির্ম্মলের বাবা সে কলেজের কমিটীর একজন সভ্য। কাল সকালবেলা কাছারী যাবার সময় তিনি অজরকে নিয়ে গিয়ে একেবারে চাকরীতে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ে আসবেন।

অজর জীবনে একটা নূতনত্ব খুঁজ্‌ছিল। দেবতা তার জীবনে এমন নূতনত্ব ঘটালেন যার কথা কল্পনাতেও কখনো উদয় হয়-নি।

মেয়ে-কলেজে সমস্ত শিক্ষয়িত্রীই মহিলা, একমাত্র সে-ই পুরুষ। প্রথমে তার একটু বাধ বাধ ঠেকেছিল বটে কিন্তু ইংরেজী না জানলেও সে ছিল বুদ্ধিমান। কিছুদিনের মধ্যেই অজর এই নতুন আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিলে।

অজর পরমোৎসাহে অধ্যাপনা সুরু কোরে দিলে। দেখতে-দেখতে প্রায় ছ-বছর কেটে গেল। অধ্যাপক হিসাবে তার সুনামও যথেষ্ট হয়েচে—এই রকম সময়ে কলেজের লেডী প্রিন্সিপ্যাল একদিন তাঁকে তাঁর খাশ কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—পণ্ডিত মশায়, আপনি কি অবিবাহিত ?

লেডী প্রিন্সিপ্যাল মাঝে-মাঝে কলেজ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ করবার জন্য অজরকে ডেকে পাঠাতেন। আজ হঠাৎ তাঁর মুখে এই প্রশ্ন শুনে অজর অবাক হোয়ে গেল। তার বিবাহের সঙ্গে কলেজের শুভাশুভ কতখানি নির্ভর করচে সে কথা কিছুতেই সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। সে ধীরে-ধীরে উত্তর দিলে—আজ্ঞে না, আমি বিবাহ করিনি।

লেডী প্রিন্সিপ্যাল কিছুক্ষণ মৌন থেকে বল্লেন—দেখুন, এ কথাটা আপনার প্রথমেই আমাদের জানানো উচিত ছিল।

কথাটা শুনে অজরের হাসিও পেল রাগও হোলো। কিন্তু সে কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে বসে রইল।

লেডী প্রিন্সিপ্যাল আবার বল্লেন—পণ্ডিত মশায়, আপনি বোধ হয়

মনে-মনে রাগ করচেন, কিন্তু আমাদের কলেজের নিয়ম হচ্ছে যে, অবিবাহিত পুরুষ শিক্ষক রাখা হবে না।

এবার অজয় বল্লে—এ নিয়মটা তা হলে আপনাদেরই আমাকে জানানো উচিত ছিল। এমন অদ্ভুত নিয়ম যে কোথাও থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

লেডী প্রিন্সিপ্যাল বল্লেন—এ ক্ষেত্রে এখন উপায় কি! আচ্ছা আপনি ইতিমধ্যে বিবাহ করতে পারেন তো?

অজয় গম্ভীরভাবে বল্লে—চাকরী রাখবার জন্য বিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না। চাকরী আমি সখ কোরে করি—পেটের দায়ে নয়।

একটুক্ষণ চুপ কোরে থেকে আবার সে বল্লে—কোন্‌দিন আপনাদের খেয়াল হবে বিবাহিত পুরুষ শিক্ষক আর রাখা হবে না, তখন স্ত্রী ত্যাগ করতে হবে তো?

অজয়ের কথা শুনে লেডী প্রিন্সিপ্যাল হেসে ফেলে বল্লেন—দেখুন, আপনি অবিবাহিত এ কথা কর্ত্তৃপক্ষ জানলে তাঁরা আমার ওপরে চাপ দেবেন।

অজয়ের মনে হোতে লাগ্‌ল যে, কর্ত্তৃপক্ষেরই একজনের সুপারিশে তার এখানে চাকরী হয়েছিল। কিন্তু হয়ত সুনির্ম্মলের বাবাও জানেন না যে, সে বিবাহিত নয়। এ নিয়ে কথা কথাকাটি করতে তার আর প্রবৃত্তি হোলো না। সে বল্লে—বেশ, আজই আমি কর্ম্মত্যাগ-পত্র দাখিল করচি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

লেডী প্রিন্সিপ্যাল বল্লেন—আপনাকে ছাড়্‌তে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আপনার অধ্যাপনায় ও সহৃদয়তায় কলেজ-শুদ্ধ ছাত্রী মুগ্ধ। আপনার মতন লোক হয়ত আমরা আর পাব না—কিন্তু আমার অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা করবেন।

—দুই—

ছ বছর পরে চাকরী ছেড়ে বাড়ীতে ফিরে এসেই অজর বুঝতে পারলে যে, জীবনের এই ছটী বছর একটী সুন্দর স্বপ্নের মতন কেটে গিয়েচে। কলকাতায় ইচ্ছা করলে সে অন্যত্র চাকরী যোগাড় কোরে নিতে পারত। তার বাবা তার মামার বাড়ীর সঙ্গে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলেন এই কয় বছর কলকাতায় থাকার ফলে সে ব্যবধান ঘুচে গিয়েছিল। ইদানীং মামাতো ভাইয়েরা তাকে অন্যত্র থাকতে দিত না। অজরের দুই মামাতো ভাই কলকাতার দুই কলেজে অধ্যাপনা করে। অজর চাকরী ছেড়ে দিয়েচে শুনে তারা বল্লে—আমরা তোমায় ভাল কাজ যোগাড় কোরে দিচ্ছি। অজরের বড় মামী ভাগ্নের বিয়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু বিয়ে কিংবা চাকরী কিছুরই প্রলোভন তাকে কলকাতায় ধরে রাখতে পারলে না। অথচ কিসের টানে যে সে আবার তার সঙ্গিহীন গৃহকোণে ফিরে এল তার কারণ সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

বাড়ীতে এসে অজর শান্তি পাচ্ছিল না। মামার বাড়ীতে তার অনেক লোক। সেখানকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, মামীদের স্নেহ, ভায়েদের ভালবাসা আবার তাকে কলকাতার দিকে আকর্ষণ করতে লাগ্‌ল। সে দিনরাত নিজের মনকে বোঝাতে লাগ্‌ল—কলকাতায় তার কোনো কাজ নেই, এইখানেই তাকে থাকতে হবে, এই তার গৃহ।

ঘরে মন বসবার জন্য সে গৃহ সংস্কার আরম্ভ করলে। তিনি চার মাস এই কাজে কাট্‌ল। তারপরে বাগান—তারপরে বিষয়-আশয়ের কাজ কর্ম্ম—এমনি কোরে সে কলকাতার ছ-বছরের স্মৃতিগুলোকে কাজের চাপ দিয়ে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

একদিন বিকেলে অজর গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরচে, এমন সময় দেখলে ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে আসচে।

মেয়েটীকে দূর থেকে দেখেই অজর বুঝতে পারলে যে, সে তাদের দেশের মেয়ে নয়। এ রকম কাপড় পরবার ধরণ আর জুতো পায়ে দিয়ে এই ভাবে একলা রাস্তায় চলা এখনো পর্য্যন্ত সেখানকার মেয়েদের মধ্যে চলন হয়-নি।

মেয়েটী হন্ হন্ কোরে এগিয়ে আসছিল। রাস্তার মাঝে এক জায়গায় খানিকটা জল দাঁড়িয়েছিল। জলের ওপরে যেটুকু রাস্তা জেগেছিল তাতে একজন লোকের বেশী পার হওয়া যায় না। অজর সেই অবধি এসে মেয়েটীকে পার হবার জন্য জায়গা ছেড়ে একপাশে সরে ঘাড় নীচু কোরে দাঁড়াল। মেয়েটী সেই রাস্তাটুকু পেরিয়ে একেবারে অজরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হোলো। অজর ঘাড় তুলে তার দিকে চাইবে কিনা ভাব্চে এমন সময় সে বলে উঠ্ল—কে পণ্ডিত মশায় না!

অজর মুখ তুলতেই মেয়েটী এগিয়ে এসে তাকে প্রণাম কোরে বল্লে—পণ্ডিত মশায় আমাকে চিন্তে পারচেন না? আমি শোভনা।

অজর শোভনাকে চিনতে পারলে। বছর চারেক আগে সে তার ছাত্রী ছিল। আই এ পাশ করার পর সে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এই ছ-বছরের মধ্যে কত মেয়ে তার ছাত্রী হয়েচে, কত মেয়ে কলেজ ছেড়ে গেছে, কত মেয়ের বিয়েতে গিয়ে সে পেট পুরে খেয়ে এসেচে তার আর ঠিকানা নেই। কলেজ ছাড়ার পরে তাদের সঙ্গে আর কখনো তার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আজ হঠাৎ পথের মাঝে এইভাবে পুরানো ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় অজরের মনটা খুশীতে ভরে উঠ্ল। সে বল্লে—শোভনা! সেই শোভনা তুমি? তোমাকে এখানে দেখতে পাব তা ভাবতেই পারিনি!

শোভনা হাসতে-হাসতে বল্লে—আপনাকে এখানে দেখতে পাব আমিই কি তাই ভাবতে পেরেছিলুম নাকি?

অজর বল্লে—ঠিক বলেচ। তারপর, এদেশে কি করতে? এখানে কি তোমার—

অজরের মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই শোভনা বল্লে—আপনি এখানে কি করতে এসেচেন তাই বলুন।

অজর বল্লে—এটা যে আমার দেশ গো। তোমাদের কাছে যে দেশের গল্প করতুম—তা এই আমার সেই দেশ। চল না আমার বাড়ী যাবে? কাছেই আমার বাড়ী, বেশী দূরে নয়।

অজর ও শোভনা পাশাপাশি চলতে লাগ্‌ল। অজর জিজ্ঞাসা করলে—তা তুমি এখানে কি করতে এসেচ তাতো বল্লে না।

শোভনা বল্লে—পণ্ডিত মশায় জানেন না বুঝি—এটা আমারও দেশ যে—

অজর হাসতে-হাসতে বল্লে—বটে! তা তো জানতে পারিনি। কবে থেকে?

শোভনা গম্ভীর ভাবে বল্লে—বছর দেড়েক থেকে।

অজর বল্লে—বেশ বেশ! বড় খুশী হলুম শুনে। তা কাদের বাড়ী?

কথা বলতে-বলতে তারা একটা মোড়ের মাথায় এসে পড়েছিল। অজরের বাড়ী যেতে হোলে এই মোড়ে ঘুরতে হয়। এইখানে দাঁড়িয়ে শোভনা মেয়ে-স্কুলের বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—ঐ যে ঐ বাড়ীটা।

অজর অবাক হোয়ে বাড়ীটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে—ওটা তো স্কুলের বাড়ী।

শোভনা এবার হাসতে হাসতে বল্লে—হ্যাঁ, ঐ আমার বাড়ী। আজ বছর দেড়েক হোলো এখানকার মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হোয়ে এসেচি। ঐ বাড়ীর ওপর তলাটা আমার। পরে মেয়ে বাড়্‌লে ও জায়গা আমায় ছেড়ে দিতে হবে—আমার অন্য বাড়ী ঠিক হবে।

বাড়ীর দরজার কাছে এসে অজর বল্লে—শোভনা বাড়ীর মধ্যে এস।

শোভনা সঙ্কুচিত হোয়ে বল্লে—বাড়ীর মধ্যে যাব পণ্ডিত মশাই? পায়ে কিন্তু জুতা রয়েছে।

অজর বল্লে—এস এস, ও জিনিষটা তো আর আমার কাছে নতুন নয়।

শোভনা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বল্লে—আপনার কাছে নতুন নয় কিন্তু বৌদি হয়ত ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবেন।

চলতে-চলতে অজর বল্লে—সে ভয় কোরো না, বৌদি-টৌদির উৎপাত এখানে নেই।

শোভনা বল্লে—পণ্ডিত মশাই কি বিয়েই করেন-নি, না—

—না সে দুর্ঘটনা এখনো হয়নি।

বাগানের দিকের চওড়া একটা বারান্দায় অজরের চাকর একখানা মাদুর পেতে দিলে। অজর বল্লে—আপাত এই মাদুরখানাতে বোসো। আমি খানকতক চেয়ার তৈরী করতে দিয়েচি। সেগুলো এলে—

শোভনা হাসতে-হাসতে বল্লে—পণ্ডিত মশাই, লৌকিকতাটুকু অন্য কারুর জন্য তুলে রেখে দিন। আমি বাঙালীর মেয়ে, মাদুরে বসেই জীবন কেটেচে। আপনার ছাত্রী আমি, আপনার এখানে এসে মাটীতে বসতেও আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

শোভনা মাদুরের ওপরে বসে বল্লে—আপনার বাড়ীর ধার দিয়ে কতদিন গিয়েচি-এসেচি। সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী আর ফুলের বাগান দেখে কতদিন মনে হয়েচে যে, বাড়ীর মধ্যে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করি, কিন্তু কি জানি কে কি মনে করবে ভেবে ঢুকতে পারিনি।

অজর বল্লে—এ বাগান আরও সুন্দর ছিল। ছ-বছর দেশছাড়া ছিলুম, কিছু তো আর দেখতে পারিনি। ভাল-ভাল গাছ আমার সব নষ্ট হোয়ে

গিয়েচে। এবার ফিরেচি, আস্তে আস্তে বাগানটাকে আবার ঠিক কোরে তুল্‌ব মনে কর্‌চি। এসব জিনিষ নিজের হাতে না করলে থাকে না।

অজর চাকরী ছেড়ে দিয়েচে শুনে শোভনা আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলে কেন চাকরী ছাড়লেন ?

চাকরী ছাড়ার কারণটা শোভনাকে বলতে অজরের কি রকম লজ্জা করতে লাগ্‌লো। সে বল্লে—অনেক দিন চাকরী করলুম আর ভাল লাগ্‌ল না।

চাকরী ছাড়ার কথা নিয়ে পাছে শোভনা বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করে এই ভয়ে অজর সে কথা চাপা দিয়ে তাকে বল্লে—তুমি এখানে দেড় বছর হোলো এসেচ অথচ আমি কিছুই জানি না! আর জান্‌বোই বা কি কোরে বল ? আমি মনে করেছিলুম তোমার বিয়ে-টিয়ে হোয়ে গিয়েচে—এলাহাবাদে কিংবা জলপাইগুড়িতে স্বামীর ঘর কর্‌চ।

অজরের কথা শুনে শোভনার মুখ লাল হোয়ে উঠ্‌ল। সে কোনো জবাব না দিয়ে ঘাড় হেঁট কোরে রইল।

অজর জিজ্ঞাসা করলে—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েচ তো অনেকদিন। এতদিন অন্য কোথাও কাজ করতে বুঝি।

শোভনা বল্লে—বাবা মারা যাবার বোধ হয় দু-মাসের মধ্যেই মা মারা গেলেন। আমি পড়লুম একা। নিজের ভরণপোষণের একটা উপায় চাইতো ?

"একটু চুপ কোরে থেকে শোভনা বল্লে—ভাগ্‌গিস্ আই-এটা পাশ করতে পেরেছিলুম তাই রক্ষা। তা না হোলে যে কী করতুম তাই ভাবি।

অজর জিজ্ঞাসা করলে—তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই ?

অশ্রুজড়িত কণ্ঠের ওপর একটুখানি হাসির প্রলেপ মাখিয়ে শোভনা উত্তর দিলে—কেউ নেই পণ্ডিত মশাই।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ কোরে রইল। তারপরে অজর বল্লে—এখানে কাজকর্ম্ম কেমন লাগ্‌চে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

শোভনা বল্লে—কাজকর্ম্ম ভালই লাগ্‌চে। এখন তো মোটে ষষ্ঠশ্রেণী অবধি হয়েচে, ভবিষ্যতে এঁদের ইচ্ছা আছে যে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়ানো হবে। মেয়েরা আমায় খুব ভালবাসে। আমি ছাড়া আরও দু-জন শিক্ষয়িত্রী আছেন, তাঁরা এখানকারই লোক। কষ্টের মধ্যে বড় এক্‌লা লাগে।

অজর বল্লে—আশ্চর্য্য তো! এতদিন এখানে আছ, কোনো বাড়ীর সঙ্গে কি আলাপ পরিচয় হয় নি?

শোভনা বল্লে—না পণ্ডিত মশাই। একে এতখানি বয়স অবধি বিয়ে হয়নি, তার ওপরে এই জুতো-মোজা-পরা মাষ্টার্‌নীকে কে কি বল্‌বে—এই ভয়ে কোথাও যাই নাই।

শোভনা অজরের মুখের দিয়ে চেয়ে দেখলে যে, সে বাগানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি ভাব্‌চে। একটু পরে শোভনা আবার বল্লে—বড্ড যখন অসহ্য মনে হয় তখন আমাদের স্কুলের যে অন্য দুজন শিক্ষয়িত্রী আছেন তাঁদের বাড়ীতে যাই। কিন্তু তাঁরা কাজের লোক, বাড়ীতে ছেলে-পিলে, সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আমার সঙ্গেই গল্প করবেন না ঘরের কাজ দেখবেন। এখন আমার প্রধান বন্ধু হচ্ছেন আমার ঝি আর স্কুলের বুড়ো দরোয়ান তেওয়ারী।

অজর হেসে বল্লে—তা বেশ।

শোভনা বল্লে—মাঝে-মাঝে বেড়াতে বেরুই। গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে অনেক দূর অবধি চলে যাই। ভাগ্যে আজ বেরিয়েছিলুম, তাইত আপনার সঙ্গে দেখা হোয়ে গেল।

অজর বল্লে—আমার সঙ্গে আজ না হয় একদিন দেখা হোতোই।

আজই তোমাদের ইস্কুলের সেক্রেটারী সমর এসেছিল। সে আমাকে ওদের কমিটীর মধ্যে নিতে চায়। সমরের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েচে তো ?

শোভনা বল্লে—তিনি প্রায়ই আসেন স্কুল সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

অজর বল্লে—আচ্ছা সমরের স্ত্রীও তো শুনেচি বেশ শিক্ষিতা। সে-ও কলকাতার মেয়ে। তার সঙ্গে আলাপ করতে তোমার কিছু আপত্তি হোতে পারে না।

শোভনা বল্লে—পণ্ডিত মশাই, আলাপ আমার কারুর সঙ্গেই করতে আপত্তি নেই। সমর বাবুরা বড়লোক, তায় আমার মনিব বল্লেই হয়। তিনি এতদিন আমাকে দেখচেন, আমি কি রকম একলা বাস করি তাও তাঁর অজানা নেই। কৈ, তিনি তো একদিনও আমাকে তাঁদের বাড়ীতে যেতে অথবা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে বলেন না!

অজর বল্লে—ঠিক ঠিক ও-কথাটা আমার মনেই হয়-নি।

শোভনা আসন ছেড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্লে—আজ উঠি পণ্ডিত মশাই, সন্ধ্যে হোয়ে এল ! আপনাকে যখন পেয়েচি তখন বোধ হয় রোজই জ্বালাতন করব।

শোভনাকে দরজা অবধি পৌছে দিয়ে অজর ফিরে এসে আবার বারান্দায় বস্‌ল, এবং একে একে তার ছাত্রীদের কথা মনে কর্‌তে লাগ্‌ল। এই শোভনার মতন হয়ত তার আরও অনেক ছাত্রী বিদেশে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করচে। হয়ত শোভনারই মতন জগতে তারা নিঃসহায়। সামান্য চাকরী বাঁচাবার জন্য নিয়ত তাদের কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়।

ভাবতে-ভাবতে অজরের মনটা খারাপ হোয়ে গেল। তবে মনে হোতে লাগল, এদের সবাইকে সে যদি সাহায্য করতে পারত।

—তিন—

সুধাংশু মুখোপাধ্যায় যখন একশো টাকা মাইনে পেত তখন অনেকেই বল্‌তো, লোকটা মোটা মাইনে পায়। সুধাংশু নিজে তার মাইনের আয়তন-টাকে খুব স্থূল মনে না করলেও সংসারে তার বিশেষ কোনো কষ্ট ছিল না। সংসারে তার বেশী লোকজন ছিল না। স্ত্রী ও একটী মাত্র মেয়েকে নিয়ে কলকাতার এক পল্লীতে কয়েকখানা ঘর ভাড়া কোরে সে থাকৃত— সুখে দুঃখে তার দিন একরকম কেটে যেত।

সুধাংশুর স্ত্রী স্বামীর ঐ আয় থেকে মাঝে-মাঝে পাঁচ দশ টাকা জমিয়েও রাখ্‌ত। তা ছাড়া দেশের সম্পত্তি বিক্রি কোরে হাজার তিনেক টাকা সুধাংশু ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিল। তারা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করৃত যে, তাদের ঐ একটি মাত্র মেয়ে তাকে বেশ ভাল পাত্রে দিতে হবে।

ভবিষ্যৎ জীবনের এই রকম একটা ছক মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে সন্তর্পণে একটী একটী কোরে বোড়ে ঠেলে সুধাংশু এগিয়ে চলেছিল এমন সময় অকস্মাৎ ইউরোপে লেগে গেল মহা সমর। সুধাংশু নিজের অনুমানের মধ্যে প্রায় সব রকম সাংসারিক দুর্ঘটনার একটা হিসাব নিকাশ কোরে রেখেছিল। কিন্তু হাজার হোলেও সে বাঙালী কেরাণী—যুদ্ধের কথা তার কল্পনা শক্তির পরিধির বাইরে থাকায় সে কথা তার মাথায় আসেনি। সুধাংশুদের আপিস ছিল অষ্ট্রিয়ান সওদাগরদের। যুদ্ধ বাধতেই তাদের আফিস গেল উঠে, সঙ্গে-সঙ্গে মোটা মাইনের চাকর সুধাংশু হোয়ে গেল একদম বেকার।

সুধাংশু পাগলের মতন চারিদিকে চাকরীর জন্য ছুটোছুটি আরম্ভ

কোরে দিলে। কিন্তু চাকরী কোথায় পাবে! তবে তার নাকি বরাত ভাল ছিল তাই বিপরীতে হিত হোয়ে গেল। বছরখানেক পরে তারই জানাশোনা এক সায়েব তাকে ডেকে চাকরী দিলেন। সায়েবের কাঠের ব্যবসা, সুধাংশুকে যেতে হবে সেই আসামের জঙ্গলে কাজের তদারক করতে—মাইনে একেবারে দুশো টাকা।

স্ত্রী ও মেয়েকে রেখেই সুধাংশুকে চাকরীতে যেতে হোলো। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে থাকতে হবে, পরিবার নিয়ে থাকবার সুবিধা নেই। তার ওপর শোভনা তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়্‌চে, একবছর পরেই সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। এই সব নানাদিক বিচার কোরে সুধাংশু তাদের রেখে একাই চলে গেল। তাদের দেখবার ভার হইল বাড়ীওয়ালা রাধিকা বাবুর ওপর।

রাধিকাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতার জমিদার! শহরে তাঁর চার পাঁচ খানা বাড়ী, তা ছাড়া তিনি নিজেও সরকারী চাকরী করতেন। রাধিকা বাবুর পরিবার খুব বড় নয়। তাই বসতবাড়ীর একটা অংশ তিনি সুধাংশুদের ভাড়া দিয়েছিলেন। অনেক দিন এক সঙ্গে থাকায় দুই পরিবারের মধ্যে বেশ সদ্ভাব স্থাপিত হয়েছিল। রাধিকা বাবুর দুই ছেলে রমেশ ও সুরেশ। ছেলে দুটী হীরের টুক্‌রো। রমেশ ম্যাট্রিকে প্রথম হোয়ে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়্‌ছিল। সে নিজের অবসর-মত সুধাংশুর মেয়ে শোভনাকে পড়াত। তারই পড়ানোর গুণে শোভনা ক্লাসের মধ্যে বরাবরই ভাল মেয়ে। রমেশ ও রাধিকা বাবুর আশ্বাস পেয়ে সুধাংশু মহা উৎসাহে আসামের জঙ্গলে চাকরী করতে চলে গেল।

চাকরী করতে গিয়ে কিন্তু সুধাংশু নিশ্চিন্ত হোতে পারলে না। হিসাব করতে গিয়ে সে জীবনে একবার ঠকেচে, হিসাব কোরে নিশ্চিন্ত হোতে

আর সে রাজী নয়। অকস্মাতের খেলায় জীবনের পাকা ঘুঁটি আবার মারা যেতে পারে এই আশঙ্কায় সে মেয়ের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে চেষ্টা করতে স্থরু কোরে দিলে।

মার মুখে তার বিয়ের কথা হচ্ছে শুনে শোভনা অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ কোরে বল্লে যে, সে বিয়ে কর্‌বে না। সে আরও জানালে যে, মাস দুয়েক বাদেই তার পরীক্ষা, এ সময়ে ও-সব কথা তুল্লে পরীক্ষায় সে তো ফেল হবেই, পরন্তু এতদিনকার একটা ইচ্ছা সফল না হোলে আশাভঙ্গ হোয়ে তার একটা অসুখও হোতে পারে।

শোভনার বিয়ের কথা শুনে রমেশও আপত্তি জানিয়ে বল্লে—মাসীমা আপনারা কি ক্ষেপেচেন! শোভনা এখন লেখাপড়া কর্‌চে, ওর মাথায় এখন ও-সব ভাবনা চাপাবেন না।

রমেশ যে শোভনার বিয়েতে আপত্তি করবে ও সে যে তার পাত্র জুটিয়ে দেবে তার কিছু কিছু আভাস শিবপ্রিয়া রমেশ ও শোভনা দু-জনের ব্যবহারে কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছিলেন। শোভনা আই এ পাশ করার পর রমেশ যে তার জন্য কোন্ পাত্র জুটিয়ে আন্‌বে তা বুঝতে শিবপ্রিয়ার বিশেষ বুদ্ধি খরচ করবার প্রয়োজন হোলো না। রমেশের মতন পাত্র পাওয়া তাঁদের সৌভাগ্যের কথা। শিবপ্রিয়া স্বামীকে সমস্ত কথা খুলে লিখলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে অন্য পাত্রদের নাকচ কোরে দেবার পরামর্শ দিলেন।

স্থধাংশু মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে আধা-নিশ্চিন্ত হোয়ে চাকরীতে মন দিলে।

শোভনা ম্যাট্রিক পাশ কোরে কলেজে পড়্‌তে লাগ্‌ল। রমেশ সেই বছরে বি-এ দেবে।

স্থধাংশু ও শিবপ্রিয়া যখন মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত সেই

সময় শোভনার ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে হাসছিলেন। শোভনাকে পড়ানো সম্বন্ধে ছেলের অত্যধিক আগ্রহ দেখে রমেশের পিতামাতা কিছুদিন থেকেই শঙ্কিত হোয়ে উঠ্ছিলেন। তাঁরা ঠিক কোরে রেখেছিলেন যে, রমেশের বিয়েতে বেশ কিন্তু মোটা রকমের দাঁও কষবেন। দরিদ্র সুধাংশু সুন্দরী মেয়ের লোভ দেখিয়ে তাঁদের সে আশায় বঞ্চিত করতে উদ্যত দেখে শীগ্‌গীরই রমেশকে অন্যত্র কোথাও চালান করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। রমেশ, শোভনা অথবা শিবপ্রিয়া কেউ তাঁদের মনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না। গোপনে তাঁদের বন্দোবস্ত চল্‌তে লাগ্‌ল।

কিছুদিন এইভাবে যায়। সেবার পূজোর সময় সুধাংশু একবার কলকাতায় এসে স্ত্রী ও মেয়েকে দিন-কতকের জন্য তার কর্ম্মস্থলে নিয়ে গেল। মাস দুয়েক বাদে ফিরে এসে তারা জানতে পারলে যে, রমেশ বিলেতে পড়তে গেছে, চার বছর বাদে দেশে ফিরবে।

রমেশের বিলেত যাওয়ার খবর শুনে শিবপ্রিয়া তো একেবারে দিশে-হারা হোয়ে পড়লেন। তিনি স্বামীকে সংবাদ পাঠালেন। সুধাংশু লিখলে—তোমায় তখুনি বলেছিলুম—এখন উপায়!

শিবপ্রিয়া আর কি উত্তর দেবেন! উপায় একমাত্র ভগবান্!

সুধাংশু আবার বন্ধুদের স্মরণ নিলে। এক হাজারের জায়গায় যৌতুকের মাত্রা দু-হাজার হোলো। বন্ধুরা অবসর-মত পাত্র দেখতে লাগ্‌ল।

দেখতে-দেখতে আরও বছরখানেক কেটে গেল। মাস চার-পাঁচ বাদেই শোভনার আই-এ পরীক্ষা; এমন সময় একদিন সকালবেলা জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে সুধাংশু বাড়ীতে এসে হাজির হোলো। কিছুদিন থেকে তার মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছিল। শেষকালে জ্বর আর ছাড়েনা দেখে তার

আফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এক রকম জোর কোরে তাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

কলকাতায় এসে সপ্তাহখানেক সুধাংশু বেশ ভালই রইল। তারপরে আবার তার জ্বর হোলো। আসামের জঙ্গলের ম্যালেরিয়া ধরেছে মনে কোরে দিন কতক ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা চল্‌ল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। শেষকালে রক্ত পরীক্ষা কোরে ডাক্তারেরা বলে দিলেন কালাজ্বর হয়েচে। শোভনার পরীক্ষা পেতে তখন মাত্র আর মাসখানেক দেরী আছে।

সুধাংশুর চিকিৎসায় জলের মতন অর্থব্যয় হোতে লাগ্‌ল। সে শিবপ্রিয়া ও শোভনার নামে সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমাত। সে টাকা খরচ হোয়ে গেল। আফিসে মাস-দুয়েক পুরো মাইনে দিয়েছিল কিন্তু শেষে তারা বলে দিলে যে, মাইনে তারা আর দিতে পারবে না। তবে সে আরাম হোলে আবার চাকরীতে এসে যোগ দিতে পারে।

জ্বর কিছুতেই ছাড়্‌চে না দেখে ডাক্তারেরা বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন। সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা তখন সব ফুরিয়ে গিয়েচে। শোভনার পরীক্ষা হোয়ে যেতেই ব্যাঙ্কের এতদিনকার সঞ্চিত টাকা থেকে হাজার খানেক টাকা তুলে নিয়ে সুধাংশু স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে দেওঘরে একটা বাড়ীতে এসে উঠ্‌ল।

দেওঘরে এসেও কিন্তু সুধাংশুর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হোলো না। বরং তার জীবন-প্রদীপ ধীরে-ধীরে স্তিমিত হোয়ে আসতে লাগ্‌ল। হঠাৎ একদিন—সেদিন কলকাতা থেকে শোভনার পরীক্ষা-পাশের সংবাদ এসেচে—সন্ধ্যাবেলা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হোয়ে সুধাংশুর ইহ-লোকের লীলাখেলা শেষ হোয়ে গেল।

সুধাংশু মারা যাবার কিছুদিন আগে থেকেই শিবপ্রিয়ার স্বাস্থ্য ভেঙে

পড়্‌ছিল। স্বামী মারা যাবার পরই সে-ও শয্যাশায়ী হোয়ে পড়্‌ল। তার-পর শোভনার অক্লান্ত সেবা, প্রবাসী বন্ধুদের দিন রাত্রি চেষ্টা, যত্ন ও সহানু-ভূতি সমস্ত বিফল কোরে দিয়ে আর একদিন সন্ধ্যার সময় সে-ও মারা গেল।

শোভনা সংসারে একেবারে একলা পড়ে গেল। কলকাতায় সে কোথায় ফিরবে! তার কাছে যা অর্থ ছিল তা দিয়ে সেখানে বোর্ডিংয়ে থেকে ছু-বছর বি-এ পড়া চলে না। দেওঘর থেকে সে রাধিকাবাবুদের কাছে মা-বাবার মৃত্যু সংবাদ লিখে পাঠালে। তাঁরা শোভনাকে এই বিপদে অনেক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলেন। কিন্তু তার মধ্যে এমন কোনো আহ্বান ছিল না যার ওপরে নির্ভর কোরে সে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারে। বছরখানেক আগে যে সংসারকে শোভনা সুখের আগার মনে কর্‌ত হঠাৎ দুটি লোকের অন্তর্দ্ধানে সেখানকার সমস্ত সৌন্দর্য্য তার চোখের সামনে থেকে ধুয়ে মুছে একেবারে সাফ হোয়ে গেল।

শোভনারা যাঁদের বাড়ীভাড়া কোরে ছিল, তাঁরা সেখানকার অনেক দিনের পুরোনো বাসিন্দা। তার অবস্থা দেখে তাঁরা শোভনাকে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। দেওঘরে তাঁদেরই একটি মেয়ে-স্কুল ছিল। স্কুলটীর জন্য অনেক দিন থেকেই তাঁরা একজন ভাল শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন কিন্তু কম মাইনে বলে ভাল লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। এই কাজটি শোভনাকে নিতে বলা মাত্র সে তখুনি তা গ্রহণ করলে। মা মারা যাবার মাসখানেক পরেই সেই দারুণ শোকের আগুন বুকে নিয়ে শোভনা সংসার ক্ষেত্রে নেমে পড়্‌ল।

বছরখানেক এইখানে চাকরী করবার পর একদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে শোভনা এই চাকরীটীর জন্য দরখাস্ত করে। এখানে চাকরী স্থির হওয়ার পর একদিন সে কাঁদতে-কাঁদতে দেওঘর ছেড়ে নতুন কাজে এসে ভর্ত্তি হোলো।

অজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তার গুরু শিষ্যার কিন্তু তবুও যেন মনে হোতে

লাগ্‌ল যে, এই নির্ব্বান্ধব পুরীর মধ্যে সে একজন পুরোনো বন্ধুর দেখা পেয়েচে। সেদিন থেকে সে প্রতিদিনই স্কুলের ছুটির পর একবার কোরে অজয়ের বাড়ীতে যেতে আরম্ভ কোরে দিলে। এতদিন পরে একজন গল্প করবার লোক পেয়ে শোভনা যেন বেঁচে গেল।

একদিন শোভনা স্কুল ছুটির পর বিকেলে বেরুবার ব্যবস্থা করচে এমন সময় দরোয়ান এসে খবর দিলে—সমরবাবু এসেচেন।

সমরেন্দ্র সান্ন্যাল শোভনাদের স্কুলের সম্পাদক। সে জমিদার এবং তারই অর্থে বর্ত্তমান স্কুল বাড়ীটা তৈরী হয়েচে। দরোয়ানের কাছে সমর এসেছে শুনে শোভনা একটু আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। কারণ স্কুল সম্বন্ধে কোনো কিছু বলতে হোলে সমর স্কুলের সময়েই আস্‌ত। সে বল্‌ত—চারটের পর আপনার ছুটী, সে সময় আপনাকে বিরক্ত করতে আস্‌ব না।

শোভনা আপিস ঘরে ঢুকতেই সমর তাকে নমস্কার কোরে বল্লে—মিস মুখার্জ্জী, অত্যন্ত অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেচি, রাগ করবেন না কিন্তু।

শোভনা মৃদু হেসে নমস্কার কোরে একটা চেয়ারে বসে বল্লে—কি দরকার বলুন তো?

সমর বল্লে—দেখুন, এমন বিশেষ কিছু নয়, তবুও সে কথাটা আপনাকে বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

শোভনার বুকের মধ্যে ধ্বক্‌ কোরে উঠ্‌ল। তবে কি তার কাজে এঁরা সন্তুষ্ট নন্‌। সেই কথাই কি ইনি জানাতে এসেচেন! তার অর্থ——

শোভনা চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরে ঘাড় নীচু কোরে বল্লে——আমার কাজে কি আপনারা সন্তুষ্ট নন্‌?

সমর বলে উঠল—না, না, সে কথা মনে করবেন না। আপনার কাজে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট।

মিনিটখানেক চুপ কোরে থেকে সমর বল্লে—আচ্ছা, অজর দার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ ?

শোভনা এ প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এ রকম প্রশ্নের অর্থ কি ? সে মুখ তুলে সমরের দিকে চাইতে পারলে না। ঘাড় নীচু কোরে ধীরে-ধীরে বল্লে—তাঁর সঙ্গে আমার গুরু শিষ্যার সম্পর্ক। কলেজে উনি আমাদের পড়াতেন।

সমর একটা—ও—বলে কিছুক্ষণ চুপ কোরে রইল। তারপর সে আস্তে-আস্তে বলতে লাগ্‌ল—দেখুন অজর দা অবিবাহিত। তার বাড়ীতে সম্পর্কীয়া কোনো স্ত্রীলোকও নেই। আপনিও অবিবাহিতা। এ ক্ষেত্রে রোজ আপনাকে তার বাড়ীতে যেতে দেখ্‌লে লোকে দুর্নাম রটাবার সুযোগ পাবে।

শোভনা সমরের এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলে না। তার মনে হতে লাগ্‌ল যেন চেয়ারখানা শুদ্ধ ঘুরতে ঘুরতে সে মাটীর মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

সমর আবার বলতে আরম্ভ করলে—দেখুন অজর দাকে আমরা জানি। তার মতন চরিত্রবান লোক আমাদের এখানে বোধ হয় আর একজন খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তবুও সে যখন একলা বাস করে সেখানে গিয়ে রোজ আপনার অতক্ষণ কোরে কাটান শোভন হয় না।

শোভনা এবার মনের সমস্ত শক্তি একত্র কোরে উত্তর দিলে—আমাকে কি করতে বলেন ?

তার এই প্রশ্নের মধ্যে অত্যন্ত একটা রূঢ় সুর বেজে উঠ্‌ল। সমর বল্লে—দেখুন মিস্ মুখার্জ্জী, ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। অজর দার ওখানে যেতে আপনার ভাল লাগে তাই আপনি যান এতে আমার কোনো কথা বলবার কি বাধা দেবার অধিকার

নেই। কিন্তু দেশের লোকের মুখ তো আপনি জানেন না। বিশেষ এই কথাটা যখন বিকৃত হোয়ে আপনার ছাত্রীদের কাণে উঠ্‌বে তখন তারা তাদের শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে কি ধারণা করবে! এইদিক দিয়েও কথাটাকে বিচার কোরে দেখবেন। আমি আপনার ওপরেই সমস্তটার বিচারের ভার দিচ্ছি। আপনি বুদ্ধিমতী—আমার কথাগুলো ভাল কোরে ভেবে দেখবেন।

সমর নমস্কার কোরে উঠে চলে গেল। শোভনা তাকে বিদায় কোরে আবার ওপরে উঠে এল। সে অজরের বাড়ীতে যাবার জন্য বেরুচ্ছিল কিন্তু তার আর বেরুনো হোলো না। একখানা চেয়ার জানলার ধারে টেনে নিয়ে এসে সে বসে বসে সমরের কথাগুলো ভাবতে লাগ্‌ল।

বাইরের এই করুণ দৃশ্য শোভনার অন্তরে একটা ব্যথার সুর জাগিয়ে তুলতে লাগ্‌ল। সে ভাবছিল, কী অসহায় অবস্থা তার! এখানে এই নিঃসহায় পুরীতে একমাত্র অজরই তো আত্মীয় বন্ধু ও সহায়। সমস্ত দিন চাকরী কোরে এক ঘণ্টা কি দু-ঘণ্টা যদি সে তার সঙ্গে গল্প কোরে কাটায় তা হোলে তার নিন্দা হবে! যারা তার নিন্দা করবে এতদিনের মধ্যে তাদের কেউ এসে তাকে ডেকে একটা কথাও তো জিজ্ঞাসা করেনি! অজরের সঙ্গে তার গুরু শিষ্যার সম্পর্ক, অজর চরিত্রবান্, অজর অজাত-শত্রু। এত গুণ তার! কিন্তু! একটী মেয়ে রোজ তার বাড়ীতে গল্প করতে যায়—এ ব্যাপারটা লোকে সাধারণভাবে নিতে পারলে না!

চিন্তায় শোভনা এত তন্ময় হোয়ে গিয়েছিল যে, সময়ের কোনো জ্ঞানই তার আর ছিল না। হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসতেই সে বাইরের দিকে চোখ চেয়ে দেখলে সূর্য্য অনেকক্ষণ ডুবে গিয়েছে, বাইরে ঘন অন্ধকার, নদীর ওপারে দু-তিনটে আলো মিট্‌ মিট্‌ করচে।

শোভনার ঘরও অন্ধকার। তার ঝি মনে করেছিল দিদিমণি বেড়াতে

গিয়েচে, এখনো ফেরে-নি। শোভনা একবার মনে করলে উঠে আলো জ্বালি কিন্তু তখুনি আবার চিন্তার জাল তাকে ঘিরে ফেল্লে।

এবার অশ্রুর আবেগ তার চিন্তার বোঝাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। সেই অন্ধকারে বসে নিজের মুখ আঁচলে ঢেকে নীরবে সে কাঁদতে আরম্ভ করলে!

অনেকক্ষণ পরে ঝি এসে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে শোভনাকে দেখে অপ্রস্তুত হোয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে—দিদিমণি খাবার দিতে বলব?

শোভনা বল্লে—না আমি খাব না, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়।

শোভনার গলার শব্দ শুনে ঝি কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মুখের চেহারা দেখে একটু থম্‌কে আস্তে আস্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঝি বেরিয়ে যাওয়ার পর শোভনা চেয়ার থেকে উঠে একখানা মাসিক-পত্র নিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিলে।

—চার—

শোভনা সেদিন থেকে অজয়ের বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ কোরে দিলে। দারুণ অভিমানে এমন কি বাড়ী থেকে বেরুনো বন্ধ করবার পর, সময় তার আর কাট্‌তে চায় না। শেষকালে সে পত্রিকাগুলোর কবিতা, প্রবন্ধ মায় বিজ্ঞাপনগুলো পর্য্যন্ত পড়তে আরম্ভ কোরে দিল।

একদিন রবিবার দুপুরবেলা একখানা পত্রিকা খুলে প্রথমেই একটি কবিতার ওপরে চোখ পড়্‌ল। কবিতাটীর লেখক——শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বার, এট্‌-ল।

নাম দেখেই শোভনার মনে হোলো, এ তাদের সেই রমেশ বোধ হয়। তার মনে পড়্‌ল রমেশ কতদিন তাকে কবিতা লিখে এনে শুনিয়েছে। সে-ই যে তার কবিতার উৎস, রমেশের মানসী যে শোভনার মধ্যে মূর্ত্ত হোয়ে রয়েচে সে কথা সে কবিতায় ও কথায়, কতবার কত রকমে শোভনার কাছে প্রকাশ করেছে। শোভনা একবার দু-বার তিনবার কবিতাটী পড়্‌লে। তার মনে হোতে লাগ্‌ল, পত্রিকাখানাকে দূত কোরে রমেশ যেন তার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। কবিতার পাতাখানা বুকে চেপে ধরে কিছুক্ষণ সে চোখ বুঁজিয়ে রইল।

শোভনার মনে হোলো এতদিন সে কবিতাগুলো পড়্‌তই না। হয়ত রমেশের এই রকম কবিতা কতবার বেরিয়েছে, অবহেলা কোরে সে পড়ে নি। সে তাড়াতাড়ি উঠে কাগজের গাদা থেকে ধূলো ঝেড়ে একরাশ পুরোনো মাসিকপত্র টেনে নিয়ে বস্‌ল।

শোভনার অনুমান মিথ্যা হয়নি। সে দেখলে প্রায় প্রতিমাসেই

কোনো না কোনো কাগজে রমেশের কবিতা বেরিয়েছে। কবিতাকে এতদিন এমনভাবে অবহেলা করেচে বলে তার নিজের ওপরে রাগ হোতে লাগল। পত্রিকাগুলো গুছিয়ে নিয়ে আগ্রহভরে সে কবিতাগুলো পড়্তে আরম্ভ কোরে দিলে।

পড়তে পড়তে শোভনার মনে হোতে লাগল, এ যেন তারই কথা কবিতার ছন্দে ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। কবির ছেলেবেলার কোন্ সঙ্গিনী—হঠাৎ যাকে তার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েচে, তারই উদ্দেশে কবি তার ব্যথার গান গেয়ে চলেচে।

পত্রিকাগুলো ভাল কোরে গুছিয়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে শোভনা গঙ্গার ধারের জানলাটার কাছে গিয়ে বস্‌ল। কবিতাগুলো পড়ে তার মনে হচ্ছিল রমেশ যেন নারী সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেচে। নারীর মনের কথা তার দৈহিক রূপের কথা কোনো কোনো জায়গায় এমন বিশদ ভাবে সে বর্ণনা করেচে যে, পড়তে পড়তে তার লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু তবু—তবু—এখন, এই মুহূর্ত্তে রমেশ এসে যদি তাকে বলে—শোভনা তুমি এখানে কেন? এ স্থান তো তোমার নয়। তুমি চল আমার বাড়ী—তোমার অভাবে গৃহ আমার শূন্য!

ভাবতে ভাবতে তার মনের কথাগুলো যেন কাণে বাজতে লাগল। সে চোখ বুঁজিয়ে চুপ কোরে বসে রইল।

হঠাৎ দরোয়ানের কথা শুনে তার চমক ভাঙ্‌ল। দরোয়ান বল্লে—দিদিমণি, পণ্ডিতজী আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এয়েচে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কে পণ্ডিতজী দরোয়ান?

দরোয়ান বল্লে—আপনি যেখানে আগে যেতেন—সেই পণ্ডিতজী।

শোভনা বল্লে—ও—আচ্ছা তাঁকে স্কুলের আফিস ঘরে বসাও, আমি যাচ্ছি।

দরোয়ান ফিরতেই শোভনা বল্লে—আচ্ছা দরোয়ান, তুমি তাঁকে এখানেই নিয়ে এস।

অজর এসেই বল্লে—শোভনা আমার ওপরে এত রাগ করেচ কেন বল দিকিন ?

শোভনা হাসতে হাসতে বল্লে—ওমা রাগ করব কেন ? কে আপনাকে এ সংবাদটী দিলে ?

অজর বল্লে—সংবাদ আবার কে দেবে ? আমি কি কিছু বুঝি না ? আজ কত দিন হোলো আমার ওখানে যাওনি বল দিকিন ?

কেন যে সে অজরের ওখানে যাওয়া বন্ধ করেচে তার কারণটা শোভনা তাকে বলতে পারলে না। কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে বল্লে—কিছুদিন থেকে নানা রকম কাজ এসে জুটেচে—স্কুলের পর যে একটু বেরুব তার সময় পাই না।

শোভনার কথা বলবার ধরণ ও তার কণ্ঠস্বরে অজর বুঝতে পারলে যে, আর কথাগুলো সম্পূর্ণ নয়, এর মধ্যে বোধ হয় অন্য কিছু কথাও আছে। সে বল্লে—কাজ হয়ত পড়েচে কিন্তু তাই কি ঠিক—অন্য কারণ কি কিছু নেই ?

শোভনা মনে করলে যে, সেদিন তার ওখান থেকে গিয়ে সমর অজরকে সেই সমস্ত কথা বলেচে। সমরের ওপরে তার ভয়ানক রাগ হোতে লাগ্‌ল। অভিমান-উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বল্লে—পণ্ডিত মশাই, আপনাকে কতদিন বলেচি—বিয়ে কোরে বৌদি ঘরে নিয়ে আসুন। তা তো আর আপনি শুনবেন না।

একটু চুপ কোরে থেকে শোভনা আবার বল্লে—বৌদি এলে দিনরাত আপনার ওখানেই আমার কাটবে—আমার আর কে আছে ?

শোভনার এই কথা গুলো শুনে অজর স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, এর মধ্যে

একটা কিছু ব্যাপার ঘটেচে। কিন্তু সে শোভনাকে সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না কোরে বল্লে—আজ আমি তোমার এখানে কেন এসেচি জান শোভনা ?

সংসারের অবিচারের কথা মনে হওয়ায় শোভনার মনে তখন পুঞ্জে পুঞ্জে অভিমানের মেঘ সঞ্চিত হোয়ে উঠ্‌ছিল। হঠাৎ অজরের সেই প্রশ্ন শুনে তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে লাগ্‌ল। তার মনে হোলো—কি বল্‌বে অজর তাকে! শঙ্কাকুল মুখভাব একটুখানি প্রফুল্ল করবার চেষ্টা কোরে সে জিজ্ঞাসা করলে—কি কথা ?

অজর হাসতে হাসতে বল্লে—কাল সকালে আমি কলকাতায় যাচ্ছি।

শোভনা যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। সে জিজ্ঞাসা করলে—কি এমন জরুরী কাজ পড়্‌ল সেখানে ?

অজর গম্ভীর হোয়ে বল্লে—ভয়ানক জরুরী, পরশু আমার বিয়ে।

শোভনা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে বল্লে—সত্যি ?

অজর বল্লে—হ্যাঁ সত্যি। আমার মামারা কলকাতার লোক জানো তো! আমার বড় মামী অনেকদিন থেকেই আমার বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। শুধু আমার অনিচ্ছায় এতদিন কিছু কোরে উঠতে পারেন-নি।

শোভনা বল্লে—তা এতদিনে বুঝি ভাগ্নের মন ফিরেছে ?

অজর বল্লে—হ্যাঁ, সংসারে থাক্‌ব আর সেখানকার রীতিনীতি মান্‌ব না ?

শোভনা হেসে বল্লে—খুব মানবেন—নিশ্চয় মানবেন। এতদিন না মেনে অন্যায়ই করেছেন।

একটু পরে শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—মেয়েটী কোথাকার ?

অজর বল্লে—মেয়েটীর বেশ দীর্ঘ ইতিহাস। তার বাপ কলকাতায় বড় কাজ করতেন। ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায় মেয়েটীকে অত্যন্ত

আদরে মানুষ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে মেয়েকে কোনো সিভিলিয়ানের হাতে সমর্পণ করবেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় লক্ষ্যচ্যুত হোয়ে আমার ঘরে এসে পড়চেন।

শোভনা বল্লে—তা হোলে তারা বড়লোক বলুন।

অজর হেসে বল্লে—বড়লোক ছিলেন বটে কিন্তু মৃত্যুর পরে নাকি প্রকাশ হোলো তাঁর কিছুই নেই, উল্টে ধার আছে। বাবা মারা যাবার পর মেয়েটীর কে এক দূর সম্পর্কের খুড়ো এসে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। তিনি নাকি আবার পূরো দস্তুরের সায়েব। এঁর সঙ্গে আবার আমার বড় মামীর কি সম্বন্ধ আছে।

শোভনা কিছুক্ষণ কি ভেবে সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করলে—দেখতে কেমন?

অজর বল্লে—আমি তো দেখিনি, তবে তার রূপের যে বর্ণনা শুনেছি তার এক চতুর্থাংশ হোলেও তাকে সুন্দরী বলতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে অজর বল্লে—আমার বোধ হয় ফিরতে দিন সাতেক দেরী হবে। মামীরা আবার সেইখানেই বৌভাত করবেন বলে শাসিয়ে রেখেছেন।

শোভনা বল্লে—বারে! সেখানে বৌভাত হবে কি রকম? এখানে আমরা বুঝি ভেসে এসেছি?

অজর বল্লে—এখানেও একদিন হবে, তার জন্য আর কি! খাটতে পারবে তো?

শোভনা বল্লে—খুব পারব।

অজর বল্লে—যাই, আরও দু-চার জনকে জানাতে হবে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—ভাবী বৌদির নামটী কি?

অজর বল্লে—ইন্দিরা।

—পাঁচ—

অজরের বিয়ে উপলক্ষ্যে শোভনার একটা সুবিধা হোয়ে গেল। সেই সুযোগে তার সেখানকার অনেকের সঙ্গেই আলাপ হোয়ে গেল। বৌ নিয়ে দেশে ফিরে অজরকে একদিন দেশের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় ও প্রতিবাসীদের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করতে হয়েছিল। পাড়ার অনেক বাড়ীর গিন্নি ও বৌঝিরা অজরের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। শোভনার এই সময় কিসের একটা ছুটী থাকায় সে-ও এই উৎসবে কোমর বেঁধে খাটতে লেগে গিয়েছিল। এই দু-তিন দিন একত্রে কাজকর্ম্ম করার ফলে অনেক বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেই তার আলাপ পরিচয় হোয়ে গেল।

কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য কোরে এতগুলি লোকের সঙ্গে শোভনার পরিচয় হোলো তার সঙ্গেই তার ভাব জম্‌ল না।

অজর যেদিন সকাল বেলা বৌ নিয়ে ফিরে এল সেদিন স্কুল ছিল বলে শোভনা সকালে যেতে পারে নি। সে মনে করেছিল, নতুন বৌ, বিদেশে এসে হয়ত তার কতই মন খারাপ কর্‌চে। কত সহানুভূতির কথা বলে সে তাকে প্রফুল্ল করে তুল্‌বে। সারাদিন ধরে কত কথা, কত কল্পনাই না তার মনের মধ্যে লাফালাফি করছিল। কিন্তু বিকেলে বৌ দেখতে গিয়ে শোভনা একেবারে থম্‌কে গেল।

ইন্দিরার আঠারো বছর বয়স কিন্তু তাকে পঁচিশ বছরের বল্লেও অবিশ্বাস হয় না। ধপ্‌ ধপ্‌ করচে তার রং তার ভেতর থেকে রক্তাভা ফুটে বেরুচ্ছে। যার দিকে সে চায় তাকেই যেন সম্ভ্রমে মাথা নীচু করতে হয়। সহানুভূতি তো দূরের কথা, তার চারপাশের বৃদ্ধা, অর্দ্ধবয়সী, যুবতী—যারা তাকে ঘিরে ভিড় কোরে আছে তাদের প্রতি একটা অবহেলা ও অনুকম্পার

দৃষ্টি দিয়ে সে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি কোরে আছে যে তা ভেদ কোরে যেন কেউ অগ্রসরই হোতে পারচে না।

শোভনা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম কোরে তার হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে বল্লে—তুমিই ভাই আমার বৌদি হও।

ইন্দিরা টাকা দেখে বল্লে—কিন্তু আপনাকে কোনো টাকা ধার দিয়েছিলুম বলে তো মনে হচ্ছে না। এ টাকা কিসের ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে উঠ্‌ল—বৌটি কিন্তু বাপু ভারি মুখরা।

ইন্দিরা একবার মাত্র ঘাড়টি ঘুরিয়ে সেদিকে চাইলে। ভিড়ের মধ্যে যে গুঞ্জন স্বরু হয়েছিল তৎক্ষণাৎ তা থেমে গেল।

ইন্দিরা আবার বল্লে—টাকা কিন্তু আপনাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

শোভনা কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় সেখানে অজয় এসে পড়্‌ল। সে শোভনাকে দেখে বল্লে—ইন্দিরা এঁর নাম শোভনা! এ আমার ছাত্রী, তোমার ননদ।

ইন্দিরা এবার শোভনাকে বল্লে—দক্ষিণা যদি দিতে হয় তো আপনার গুরুকে দিন।

শোভনাকে কিন্তু টাকা কটি ফিরিয়ে নিতেই হোলো। সে ক্ষুণ্ণ হোলো বটে কিন্তু মনে মনে ভাবলে একটা কিছু গয়না গড়িয়ে পরে সে ইন্দিরাকে উপহার দেবে।

বিয়ে বাড়ীর গোল চুকে যাবায় পর শোভনা প্রত্যহই অজয়দের বাড়ী যায় কিন্তু ইন্দিরার নাগাল আর পায় না। সে কখনো বাগানে, কখনো বই পড়ায়, কখনো বা ব্লাউসে ফুল তোলায় এত ব্যস্ত থাকে যে তার কাছে ঘেঁষ্‌তেই শোভনার সাহস হয় না। অজয়ের বিয়ের পর আজকাল সমরও মাঝে মাঝে বিকেলে তাদের ওখানে আসে। ইন্দিরা মাঝে মাঝে অজয়ের পুরুষ বন্ধুদের সাম্‌নেও বেরোয়, তাদের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ

করে আবার কখনো বা দু-তিন দিন তার দেখাই পাওয়া যায় না। ইন্দিরা তার কথাবার্ত্তা, চালচলনে এমন একটা আভিজাত্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে তা ভেদ কোরে তাকে বন্ধুত্বের গণ্ডির মধ্যে আনতে শোভনার সাহসেই কুলোয় না।

একদিন শোভনা বিকেলবেলা অজরদের বাড়ীতে গিয়ে দেখলে যে অজর খাটের ওপরে বসে একমনে একখানা ইংরেজী রীডার পড়্‌চে। শোভনা এসে পড়ায় অজর বইখানা সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল কিন্তু তার আগেই সেখানা শোভনার চোখে পড়ায় সে বলে উঠ্‌ল—ওখানা কি বই পণ্ডিত মশাই ?

অজর অপ্রস্তুত হোয়ে বল্লে—ও একখানা ইংরেজী বই।

শোভনা বইখানা হাতে নিয়েই ব্যাপার বুঝতে পারলে। এই বয়সে যে কেন আবার ইংরেজী শিশু-শিক্ষা ধরতে হয়েচে তার কারণ আন্দাজ করতে তার একটুও দেরী হোলো না। সে অজরকে উৎসাহ দিয়ে বল্লে—তা এরকম নির্জ্জনে একলা বসে পড়বার মানে ?

অজর বল্লে—এতক্ষণ সজনই ছিল। এইমাত্র তোমার বৌদি সমরদের বাড়ী গেলেন। তুমি যাওনি সেখানে ?

শোভনা আশ্চর্য্য হোয়ে কিছুক্ষণ অজরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে—আমি যাব—তার মানে ?

অজর বল্লে—আজ সমরের স্ত্রী মেয়েদের নেমন্তন্ন করেচে। আমি মনে করেছিলুম তোমারও বুঝি নেমন্তন্ন হয়েচে।

শোভনা শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে সেখানে তার নেমন্তন্ন হয়নি। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আর কোনো আলোচনা হোলো না।

কিছুক্ষণ পরে অজর শোভনাকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা শোভনা, কতদিন শিখলে ইংরেজীতে বেশ কথাবার্ত্তা বল্‌তে পারা যায় ?

প্রশ্নটা শুনে শোভনার হাসি পেল। সে বল্লে—ভালো কোরে শিখলে বছর দুয়েকের মধ্যেই পারা যায় বলেই তো মনে হয়।

অজয় বল্লে—তুমি আমাকে শেখাবে?

শোভনা বল্লে—কেন বৌদি তো শেখাতে পারেন!

অজয় বল্লে—তার—সময় নেই! তা ছাড়া সে বড় বিরক্ত হয়।

অজয়ের এই কথাটা শোভনার মনে একটা বিষম ধাক্কা দিলে। সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন মিল নেই।

অজয়ের প্রতি সহানুভূতিতে তার মন পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে বল্লে—কি এমন কাজ বৌদির? সারাদিন তো আড্ডা দিয়ে বেড়ানো হয়, ঘণ্টা খানেক সময় পান না আপনাকে পড়াবার?

অজয় হাসতে হাসতে বল্লে—পড়ানো জিনিষটা বড় শক্ত কাজ শোভনা। সময় থাকলেও সকলে তা পারে না, বিশেষ আমার মতন এই বুড়ো ছাত্রকে। তবু ইন্দিরাই তো এই কয়মাসে আমাকে এতদূর শিখিয়েচে!

অজয়ের এবারের কথায় শোভনার মনে হোলো যে, সে ইন্দিরার ওপরে অবিচার করেচে। অজয়ের কথার মধ্যে কৈ তার প্রতি অভি-যোগের লেশমাত্রও নেই। তার প্রতি নিজের যে অভিমান আছে তাই দিয়ে এই স্বামী স্ত্রীর কথা বিচার কোরে সে ইন্দিরার ওপর মস্ত অবিচার কোরে ফেলেচে। শোভনা ভাবলে যে ভবিষ্যতে সে এ সম্বন্ধে সাবধান হ'বে। সে বল্লে—আপনাকে পড়ালে বৌদি আবার আমার ওপর চটে যাবেন না তো?

অজয় বল্লে—আরে না না। সে সে রকম নয়। বরং সে তোমার ওপর খুশীই হবে। আমাকে পড়ানোটা বিশেষ সুখকর ব্যাপার নয়।

—আচ্ছা কাল থেকে পড়াব, আজ থাক পণ্ডিত মশাই।

এই বলে শোভনা সেদিন বিদায় নিলে।

পরদিন থেকে শোভনা প্রত্যহ অজয়কে পড়াতে লাগ্‌ল।

একদিন শোভনা বিকেলে অজয়দের বাড়ীতে গিয়ে দেখলে যে সেখানে ছোটখাট একটি উৎসবের আয়োজন হয়েচে। খাওয়া দাওয়ার আয়োজন দেখে শোভনা অজয়কে বল্লে—পণ্ডিত মশাই অসময়ে এসে পড়েচি বোধ হয়?

শোভনাকে দেখে অজয়ও যে একটু অপ্রস্তুত হোয়ে না পড়েছিল তা নয়। তবুও সে ভাবটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে সে বল্লে—তোমার আবার সময় অসময় কি! এ তো তোমারই বাড়ী।

শোভনার একবার ইচ্ছা হোলো বলি—সে কথা আর বৌদি আসার পর বলা চলে না।

কিন্তু অজয়কে আঘাত দিতে তার মন চাইল না। অজয় যে তাকে অত্যন্ত আপনার জন মনে করে, তার পরিচয় শোভনা অনেকদিন অনেকভাবে পেয়েছে। সে তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে বসে রইল।

শোভনা অজয়ের বসবার ঘরে বসেছিল। বাড়ীর ভেতরে যে নারী সমাগম হয়েচে তার আভাষ সেখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর অজয় উঠে বল্লে—শোভনা যেও না, আমি আস্‌চি।

অজয় উঠে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। শোভনা সেখানে বসে বসে ভাবতে লাগ্‌ল—কি অধিকার তার এই পরিবারের মধ্যে! কিসের অধিকারে সে ইন্দিরার স্নেহ ও বন্ধুত্বের দাবী করে!

হঠাৎ অজয়ের পদশব্দ কাণে যেতেই তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়্‌ল।

অজর ফিরে এসে কিছু না বলে চেয়ারখানার ওপরে ধপাস কোরে বসে পড়্‌ল। সে যে বাড়ীর মধ্যে ইন্দিরাকে শোভনার আগমন সংবাদ দিতে গিয়েছিল সে কথা সে আগেই বুঝতে পেরেছিল। অজর ফিরে আসতেই শোভনা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলে যে তার মনের মধ্যে মেঘের সঞ্চার হয়েচে। হয়ত তাকে নিয়েই তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। কথাটা মনে হোতেই শোভনার অত্যন্ত বিশ্রী লাগ্‌তে লাগ্‌ল। সে উঠে বল্লে—আমি যাই পণ্ডিত মশাই!

অজর আপনার মনে যেন কি ভাবছিল। হঠাৎ শোভনা উঠে পড়তেই সে চম্‌কে উঠে বল্লে—এঁ্যা—যাবে! এই তো এলে!

শোভনা বল্লে—হ্যাঁ যাই। আর এক সময় আস্‌ব'খন।

অজর কি রকম অপ্রস্তুতের মতন দাঁড়িয়ে রইল। শোভনা আর কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসেই শোভনা মনে করলে আর সে কখনো এ বাড়ীতে আস্‌বে না।

সেদিন শোভনা গঙ্গার ধার দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে যখন বাড়ী ফির্‌ল তখন রাত্রি হোয়ে গিয়েচে।

—ছয়—

সেদিন অজরদের বাড়ীতে গিয়ে শোভনা সত্যই অন্তরে আঘাত পেলে। অজরের স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তা যে খুব ঘনিষ্ঠ হোয়ে উঠ্‌বে এ কথা শোভনা আগে থাকতেই ঠিক কোরে রেখেছিল। কিন্তু ইন্দিরার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে যতবার শোভনা তাকে অন্তরঙ্গতার গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেচে ততবারই সে বিফল হয়েচে। এ জন্য শোভনার মনের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। অজর তার স্ত্রীর এই রকম ব্যবহারের জন্য যে লজ্জিত ও দুঃখিত শোভনা তা বুঝতে পারত। কিন্তু পাছে এই নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম বিবাদ ঘটে সে জন্য এ বিষয়ে সে অজরকে কখনো কোনো অনুযোগ তো করেই নি বরং সে অজরের কাছে ইন্দিরা সম্বন্ধে এমন একটা ভাব প্রকাশ করত যাতে অজরের মনে হোতে পারে যে তার স্ত্রীর সঙ্গে শোভনার ভাবটা খুবই জমাট হোয়ে উঠেছে।

সেদিন ইন্দিরা সমর ও তার স্ত্রীকে নেমন্তন্ন করেছিল। পাড়ার আরও দু-চারজন মেয়েও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন অথচ শোভনা—যে প্রত্যহ তাদের বাড়ীতে যায় তার নিমন্ত্রণ হোলো না—এ ব্যাপারটাকে সে খুব হাল্কাভাবে নিতে পারলে না।

অজরদের বাড়ী থেকে বেরিয়েই সেদিন শোভনার মনে হোলো যে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন ভাব হওয়া উচিত তেমন নেই। অজর তাকে বসিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য ভেতরে গিয়েছিল। শোভনাকে নিমন্ত্রণ করা সম্বন্ধে সে যে ইন্দিরাকে বলতে গিয়েছিল সে কথা সে তখুনি বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু স্বামীর অনুরোধ সত্ত্বেও ইন্দিরা তাকে নিমন্ত্রণ

করলে না। কথাটা মনে হওয়া মাত্র ক্ষোভে ও লজ্জায় শোভনার কান্না পেতে লাগ্‌ল। তার মনে হোলো—ছি ছি, আর ওখানে কখনো যাব না।

সন্ধ্যার পর শোভনা তার নিরালা ঘরে ফিরে এসে গঙ্গার ধারের জানালাটা খুলে বাইরের দিকে মুখ বাড়ালে। কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, ঘন অন্ধকার। এত অন্ধকার যে বাইরে কিছুই দেখা যায় না। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল যেন সে একটা বিরাট অন্ধকার গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে সে তাড়াতাড়ি জানালার কাছে থেকে ফিরে এসে বাতিটা জ্বালিয়ে বিছানার ওপরে গা ঢেলে দিলে।

বিছানায় পড়ে কিছুক্ষণ সে ঘুমোবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম এল না। কি রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি তার বুকের মধ্যে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছিল। তার কেবলি মনে হোতে লাগ্‌ল সংসারে সে একা এ কথা অনেকবার তার মনে উদয় হয়েচে, কিন্তু এমন প্রবলভাবে কখনো সে দুঃখ তার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল, এর চেয়েও দেওঘরে সে ঢের বেশী সুখে ছিল। সেখানে মাইনে এখানকার চেয়ে ঢের কম ছিল বটে, কিন্তু সেখানে লোকজন, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের অভাব ছিল না। বেশী মাইনে না পেলেও সেখানে তার অন্ন বস্ত্রের অভাব তো ছিল না। বেশী মাইনের তার প্রয়োজনই বা কি? তার নিজের খরচ অল্প, কার জন্য সে অর্থ জমায়! যদি তার নিজের বলতে কেউ থাক্‌ত। একটি ছোট্ট সংসার—স্বামী, একটী ছোট্ট ছেলে, একটী ছোট্ট মেয়ে—তারা গলা জড়িয়ে ধরে মা বলে ডাক্‌বে। তার বাবা মা যদি তখন তার কথা না শুনে তার বিয়ে দিয়ে যেতেন। কী দুর্ভাগ্য নিয়েই সে সংসারে এসেচে।

একদিন শোভনা তার একটা কবিতা ছদ্মনামে এক মাসিক পত্রিকায়

পাঠিয়ে দিলে। কবিতাটি মাসিক পত্রের অঙ্কে ছাপার অক্ষরে দেখবার সৌভাগ্য সে কল্পনাও করতে পারে নি। কিন্তু সত্যিই যখন সেটা প্রকাশিত হোলো তখন শোভনা আনন্দে আত্মহারা হোয়ে উঠ্‌ল। এ আনন্দ তাকে রমেশের প্রথম চুম্বনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগ্‌ল!

শোভনা সাহিত্য সাধনায় নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলে। প্রতি মাসে নানা কাগজে কল্পনা দেবীর কবিতা প্রকাশিত হোতে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে তার মনে হোতো এ শক্তি এতদিন তার কোথায় লুকিয়ে ছিল।

একদিন বিকেলে শোভনা ঘরে বসে লিখ্‌চে এমন সময় দরোয়ান এসে জানালে—সেকেরটারী বাবু এয়েচে।

সমর স্কুল সম্বন্ধে কি সব প্রয়োজনীয় পরামর্শ করতে এসেছিল। তাদের কথাবার্ত্তা শেষ হোয়ে যাবার পর সে বল্লে—আপনি জানেন না বোধ হয়—অজরদার বড় অসুখ।

শোভনা চম্‌কে উঠে বল্লে—কার! পণ্ডিত মশাইয়ের কি অসুখ?

সমর বল্লে—অসুখটা যে কি তা বলতে পারিনা, তবে সাংঘাতিক অসুখ। ডাক্তারেরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখনো তাঁরা ঠিক কোরে কিছু বলতে পারচেন না।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কতদিন হয়েচে অসুখটা?

সমর বল্লে—তা প্রায় তিনমাস হলো।

শোভনা বল্লে—আজ তো রাত্রি হোয়ে গিয়েচে, কাল যাব।

পরদিন স্কুলের ছুটির পর কাজকর্ম্ম সেরে শোভনা যখন অজরদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো তখন সন্ধ্যা হোয়ে গিয়েছে। শীতের সন্ধ্যা, পল্লীগ্রামে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দীপ জ্বলে উঠেচে। কিন্তু অজরদের গৃহদ্বারে প্রদীপ নেই। শোভনা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল, কোথাও

একটু আলো নেই। কোনো রকমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দূরে অজরের শোবার ঘরে আলো লক্ষ্য কোরে সেই দিকেই চল্‌ল।

চারিদিক স্থির, নিস্তব্ধ। শোভনা চৌকাঠের কাছে জুতো খুলে রেখে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘরের ঠিক মাঝখানে পুরোনো আমলের প্রকাণ্ড একখানা ভারী খাট পাতা। এক কোণে পেতলের পিলসুজের ওপরে একটা প্রদীপ জ্বল্‌চে। প্রদীপের মৃদু আলোতে ঘরে নিস্তব্ধতাকে যেন আরও গভীর ও রহস্যময় কোরে তুল্‌ছিল। ঘরের মধ্যে লোকজন কেউ কোথাও নেই, শোভনা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে খাটের শিয়রে এসে দাঁড়াল।

খাটের ওপরে অজর শুয়েছিল, চক্ষু দুটি তার মুদ্রিত, গলা অবধি লেপ দিয়ে ঢাকা। অনেকদিন কামানো হয়নি বলে মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ।

অজরের সেই শীর্ণ মুখ দেখেই শোভনার মনে হোলো যেন মৃত্যুর ছায়া তার সেই গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখখানাকে মলিন কোরে ফেলেচে। হঠাৎ তার মনে বহুদিন বিস্মৃত মৃত পিতার সেই মুখখানা মনে পড়ে গেল। তার যেন কি রকম ভয়-ভয় করতে লাগ্‌ল। সে খাটের একটা কোণা চেপে ধরলে।

অজরের সেই নিস্পন্দ দেহ দেখতে দেখতে শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল—এও তো মৃত। তাই বুঝি ইন্দিরা ভয়ে কোনো প্রতিবাসীদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েচে। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল—ছুটে পালিয়ে যাই। সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালে। সেখানে অন্ধকার—ঘন অন্ধকার। একবার যেন মনে হোলো সেই অন্ধকারে শাদা মতন কি একটা চলে বেড়াচ্ছে। সেটা বোধ হয় অজরের অশরীরি আত্মা। বেরুতে গেলেই সে যদি শোভনার পথ আট্‌কায়। শোভনা কাঁপতে

কাঁপতে ঘাড় ফিরিয়ে আবার অজরের দিকে চাইলে। একবার যেন তার মনে হলো তার ক্ষীণ নিঃশ্বাস পড়্‌চে। শোভনা তার কম্পমানা হাতখানা ধীরে ধীরে অজরের কপালে রাখলে।

মাথায় হাত পড়্‌তেই অজর ক্ষীণ স্বরে বল্লে—কে ইন্দিরা ?

শোভনা বল্লে—পণ্ডিত মশাই আমি।

অজর চোখ চেয়ে শোভনাকে দেখে বল্লে—শোভনা—বোসো।

খাটের পাশে একখানা চেয়ার ছিল, শোভনা তার ওপরে গিয়ে বস্‌ল।

অজর বল্লে—অনেক দিন তোমায় দেখিনি, কেমন আছ ?

অজরের প্রশ্নে শোভনার লজ্জা হোলো। সে বল্লে—আমি তো ভাল আছি পণ্ডিত মশাই, কিন্তু আপনার এত বড় অসুখ আমি কোনো খবরই পাই-নি। কাল রাত্রে শুনলুম যে আপনার অসুখ।

অজর একটু হাসবার চেষ্টা কোরে বল্লে—খবর দিলেই কি আসতে ? তুমি তো আমাকে ত্যাগ করেছ।

শোভনা এ কথার কোনো জবাব দিতে পারলে না। কিছুক্ষণ পরে অজর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে···আমাকে সবাই ত্যাগ করেচে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কি অসুখ, কতদিন হয়েচে ?

অজর বল্লে—অসুখ যে কি তা বুঝতে পারচি না। মাস তিনেক আগে একদিন স্নান করতে করতে কি রকম হাত পা অবশ হোয়ে অজ্ঞান হোয়ে পড়লুম। জ্ঞান হোয়ে দেখি চারিদিকে ডাক্তার বসে আছে আর আমি এই খাটের ওপরে শুয়ে আছি। বাম অঙ্গটা নাড়্‌তে পারতুম না, এখন যেন একটু একটু কোরে জোর পাচ্ছি। ডাক্তারেরা বলচেন যে, শুয়ে থাকাই হোলো এ রোগের ওষুধ। অন্ততঃ এখনো অনেক দিন শুয়ে থাকতে হবে।

একটু চুপ কোরে থেকে অজর বল্লে—উঠ্‌তে ইচ্ছা করে কিন্তু ওঠবার শক্তিই নেই।

শোভনা চুপ কোরে বসে রইল। সে যে কি প্রশ্ন করবে তা নিজেই বুঝতে পারছিল না। অজর একবার জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে চাইলে। শোভনা তার চোখ থেকে নিজের চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চারদিকে একবার চেয়ে বল্‌লে—ঘরটা বড় অন্ধকার লাগ্‌চে, একটা কেরোসিনের বড় আলো দিলে হয় না? রুগীর ঘরে—

অজর বল্‌লে—না বেশী আলো চোখে বড় লাগে। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—বৌদি কোথায়? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না যে?

অজর একটু হেসে বল্‌লে—তাঁকে আজ কাল আর কেউ দেখতে পায় না।

শোভনা বিস্মিত হোয়ে বল্‌লে—সে কি!

অজর বল্‌লে—হ্যাঁ, সে এখানে নেই।

—এখানে নেই! কোথায় গিয়েচেন, তা যাবার সময় কিছু বলে যান নি?

ব্যাপারটা যে কি তা শোভনা মোটেই বুঝতে পারলে না। সে অবাক হোয়ে অজরের কথাগুলোর অর্থ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। একবার তার মনে হোলো ইন্দিরা কি মারা গিয়েচে! কিন্তু তা হোলে কি সে একটা খবর পেত না।

তার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়ে অজর বল্‌লে—আমিও কোনো খোঁজ করি নি।

শোভনা বল্‌লে—তবে! ঝগড়া হয়েছিল বুঝি? অজর বল্লে—কিছু-মাত্র না। একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে দেখি যে সে নেই। তারপর থেকে তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্চে না।

শোভনা বল্লে—পরে লোকটা কোথায় গেল, সে বেঁচে রইল কি জলেই ডুবে মরল। তার খোঁজ করা উচিত ছিল। কোথায় গিয়েছে বলে সন্দেহ হয় আপনার ?

অজর হেসে বল্‌লে—আমার কোনো সন্দেহই হয় না। যাবার কিছুদিন আগে কলকাতায় যাবে বলেছিল।

শোভনা চুপ কোরে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে মস্ত একটা প্রহেলিকার মতন ঠেক্‌ছিল।

অজর বল্‌লে—শোভনা, আমার বিয়েতে তুমি খুব উৎসাহী ছিলে, না ?

শোভনা এবারও কোনো উত্তর দিলে না। অজর বলতে আরম্ভ করলে—ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় সে সুখী হয় নি। ইন্দিরা হাবে ভাবে, কথায় ও কাজে নিশি দিন ঐ কথাই প্রকাশ করত। কিন্তু আমি তো তাকে জোর করে বিয়ে করি নি। আমাকে তার ভাল না লাগলেও এমনভাবে তার যাওয়া উচিত হয় নি। কি বল শোভনা ?

শোভনা এবারও কোন উত্তর দিলে না। অজর জিজ্ঞাসা করলে—কি শোভনা কথা বল্‌চ না যে ?

শোভনা এবার বল্‌লে—পণ্ডিতমশাই আপনার সেবা করচে কে ?

অজর বল্‌লে—আমার ছেলেবেলার চাকর রামেশ্বর আছে। সেই আমার সেবা করে। তা ছাড়া ঝি আছে, সে-ও পুরোনো লোক। সন্ধ্যাবেলা সব এদিকে ওদিকে কাজে গেছে—এখুনি সব এসে হাজির হবে।

সেদিন শোভনা যখন অজরদের বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরুল তখন অনেক রাত্রি। এখানে এসে অবধি এত রাত্রে সে কখনো রাস্তায় বেরোয় নি। অন্ধকার রাত্রে সে বিজন পথের মধ্যে একলা বাড়ী ফিরতে হয়ত

অন্য কোনোদিন সে পারত না। কিন্তু তার মনের মধ্যে এমন ঝড় উঠেছিল যে তার ঝাপটে বাইরের কোনো ভয়ই তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারছিল না।

পৌষের শীত-বাতাস একবার গাছগুলোর মধ্যে একটা হাহাকার জাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। শোভনার মনে হোলো তারা যেন ইঙ্গিতে তাকে কি কথা বল্‌লে। নানা রকম চিন্তায় তার মাথা গোলমাল হোয়ে যেতে লাগ্‌ল। বাড়ীতে ফিরে সে বেশ কোরে মাথায় জল দিয়ে জানলা খুলে শুয়ে পড়্‌ল।

—সাত—

অজরের সেই অবস্থা দেখে আসার পর থেকে শোভনা রোজ স্কুলের ছুটীর পরে তার কাছে যেতে আরম্ভ করলে। তার সঙ্গে কথা বলে অজর যে মনে শান্তি পায় সে কথা সে জান্‌ত। এইজন্য সে সাহিত্যের চর্চ্চা কমিয়ে দিয়েও তার পণ্ডিতমশাইয়ের প্রতি এই কর্ত্তব্যের ত্রুটি করত না।

মাসখানেকের মধ্যেই অজর একটু একটু কোরে শক্তি ফিরে পেতে লাগ্‌ল। বিকেল বেলা তাকে বাগানের সামনের বারান্দার ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হোতো। তারই কিছু পরে শোভনা আস্‌ত। সন্ধ্যে হবার পর তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে তাকে খাইয়ে তবে শোভনা বাড়ী ফিরত।

একদিন বসন্তের উতলা বাতাস দিকে দিকে নব জীবনের সাড়া জাগিয়ে তুলেচে। শোভনা সেদিন গঙ্গার ধারে খানিক বেড়িয়ে অজরদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। তখনো সন্ধ্যা হোতে দেরী ছিল। শোভনা সোজা বারান্দায় গিয়ে দেখলে যে অজরের ইজিচেয়ারখানা খালি পড়ে রয়েচে। সেখানে অজরের দেখা না পেয়ে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলে যে অজর স্থির হোয়ে বিছানায় পড়ে আছে। শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—পণ্ডিত মশাই, আজ বারান্দায় গিয়ে' বসেন নি—?

অজর বল্‌লে—না আজ আর শরীরটা ভাল লাগ্‌চে না।

শোভনা খাটের পাশে চেয়ারখানা টেনে তাতে বসে বল্লে—কি হলো আবার শরীরের?

অজর বল্‌লে—কি রকম দুর্ব্বল লাগ্‌চে আর শরীরটা ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করচে।

শোভনা অজয়ের মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে—এতো দিব্যি জ্বর এসেচে দেখ্‌চি!

অজয় বল্‌লে—জ্বর এসেচে নাকি! কত জ্বর দেখ দিকিন্‌ একবার থার্ম্মোমিটারটা এনে!

শোভনা টেবিল থেকে থার্ম্মোমিটার এনে জ্বর দেখে বল্‌লে—একশো এক।

অজয় ধীরে ধীরে বল্‌লে—আবার জ্বরটা এল। এবার বোধ হয় আর বাঁচবো না।

অজয়ের কণ্ঠস্বরে এমন একটা নিরাশার সুর বেজে উঠ্‌ল যে তা শুনে শোভনার চোখে জল দেখা দিল। এই নির্ব্বিরোধী স্নেহশীল অজয় দিনে দিনে শোভনার হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা অধিকার কোরে নিয়েছিল। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল কি অসহায় অজয়! তার চেয়েও ঢের বেশী অসহায়।

শোভনা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে—কিছু কুপথ্য করেছিলেন নাকি?

অজয় একটু হেসে বল্‌লে—পথ্যই পাই না তার আবার কুপথ্য আর সুপথ্য।

শোভনা রামেশ্বরকে ডেকে তক্ষুনি ডাক্তারের বাড়ীতে খবর দিতে বল্‌লে।

রামেশ্বর চলে যাবার পর অজয় বল্‌লে—আজ সাতদিন ওযুধটা খাই নি। মনে করলুম বেশ তো সেরে উঠ্‌চি আর ওষুধ খাবার বোধ হয় দরকার হবে না।

শোভনা বল্‌লে—বড্ড অন্যায় করেচেন পণ্ডিত মশাই। ডাক্তার যত দিন না বারণ করচেন ততদিন ওযুধ খেতে হবে বৈকি?

অজয় চুপ কোরে রইল। শোভনা আবার বল্‌লে—দেখুন তো,

নিজের দোষে আবার জ্বর কোরে বস্‌লেন। এমন কতদিন ভুগবেন কে জানে!

অজর বল্‌লে—ওষুধ খাওয়া আর কেন শোভনা? আমি আর বাঁচতে চাই না। কি হবে আর বেঁচে?

অজরের কথা শুনে শোভনার অনেক কথাই বলবার ইচ্ছা হোতে লাগ্‌ল কিন্তু কোনো কথাই সে বল্‌তে পারলে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাট্‌ল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে উঠ্‌তে লাগল। বাইরে যে পাগল বাতাসের মাতামাতি চলেছিল তারই এক একটা ঝট্‌কা খোলা জানলাগুলো দিয়ে হুড়মুড় কোরে ঘরের মধ্যে ঢুকে সেই অন্ধকারে তাদের দু-জনকে মাঝে মাঝে চম্‌কে দিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটাবার পর ঝি এসে ঘরের এক কোণে প্রদীপটা রেখে সেদিকের জানালাটা বন্ধ কোরে দিয়ে চলে গেল।

ঝি চলে যাবার পর অজর বলতে আরম্ভ করলে—দেখ শোভনা, অনেক আশা কোরে সংসার পেতেছিলুম কিন্তু ইন্দিরা আমাকে বড় দুঃখ দিয়ে গেছে। কিসের অভাব ছিল তার এখানে! আমাকে সে বিয়েই বা করলে কেন! সে আপত্তি করলে কেউ জোর কোরে তার বিয়ে দিতে পারত না।

শোভনা চুপ কোরে অজরের কথাগুলো শুনে যেতে লাগ্‌ল, কোনো উত্তর সে দিতে পারলে না।

অজর বল্লে—দেখ আমার মার সঙ্গেও আমার বাবার বনত না। কিন্তু মা যতদিন বেঁচেছিলেন তাঁর মুখে কোনোদিন কোনো অভিযোগ কেউ শুনতে পায় নি। সেই ঘরের কুললক্ষ্মী হোয়ে—

ডাক্তারের পায়ের আওয়াজ হোতেই অজর চুপ করলে। ডাক্তার এসে

নাড়ী দেখে বল্লে—আবার জ্বর এল কেন? ওষুধটা নিয়ম মত খাওয়া হচ্ছে তো?

অজর কিছু বল্লে না। তার হোয়ে শোভনা বল্লে—আজ সাতদিন ওষুধ খাওয়া হয় নি।

ডাক্তার চমকে উঠে বল্লে—এঁ্যা! কেন?

এবার অজর বল্লে—একদিন ভুলে গেলুম, আর একদিন ভালো লাগ্‌ল না—পরদিন মনে করা গেল, আর তো সেরে উঠচি—

ডাক্তার বল্লে—ছি ছি অজর দা! এ রকম করলে তো অসুখ ভালো হবে না। ওষুধ এখন নিয়মিত খেতে হবে।

ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়ে চলে গেলেন। শোভনা তখুনি চাকর পাঠিয়ে ওষুধ আনিয়ে একদাগ ওষুধ অজরকে খাইয়ে দিলে।

ওষুধটা খেয়েই অজর বল্লে—শোভনা এবার আমি নিশ্চয় সেরে উঠ্‌ব। এতদিন সারতে পারি নি কেন জান?

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কেন পণ্ডিত মশাই?

অজর বল্লে—তোমার হাতে ওষুধ খেতে পাই নি বলে!

অজরের কথা শুনে শোভনার বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ধ্বক্ ধ্বকানি সুরু হোলো। কিন্তু হৃদয়ের সেই অস্বাভাবিক স্পন্দন তার দেহে মনে অশান্তির বদলে একটা মধুর পুলক সঞ্চার করলে। সে মুহ্যমানার মতন স্থির হোয়ে বসে রইল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে অজর বল্লে—কি শোভনা কথা কইচ না যে?

শোভনা বল্লে—ভাব্‌চি

অজর প্রশ্ন করলে—কি ভাব্‌চ শোভনা?

—ভাব্‌চি—আপনার জন্য একজন নার্স রাখলে কেমন হয়?

অজর কোনো উত্তর দিলে না।

শোভনা বলতে লাগ্‌ল—ঠিক সময়ে ওষুধ, ঠিক সময়ে পথ্য না পড়্‌ল অসুখ সারা যে মুস্কিল হবে। রুগীর কি আর ওষুধ খাবার কথা মনে থাকে!

অজর বল্লে—তবু যদি আমার নিজের নড়বার ক্ষমতা থাক্‌ত তা হোলে কোনো লোকের সাহায্যই দরকার হোতো না। এতদিন তো একলাই কাটিয়েচি। এর মধ্যে অসুখ-বিসুখও হয়েচে কিন্তু আমি নিজেই নিজের সেবা করেচি। এবারকার রোগ যে আমায় একেবারে পঙ্গু কোরে ফেলেচে!

শোভনা চুপ কোরে রইল। অজর একটু চুপ কোরে থেকে বল্লে—আর একলা সারাদিন চুপটী কোরে এই খাটে পড়ে থাকা—এ যে রোগ যন্ত্রণার চাইতেও বেশী। কি যে কষ্ট তা বোধ হয় তুমি একটু একটু বুঝতে পার, কারণ তোমায় একলা কাটাতে হয়।

শোভনা বল্লে—সামনেই আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি। সে সময় আমি দিন রাত্রি এখানে এসে থাক্‌ব। আমার যে স্কুল রয়েচে পণ্ডিত মশাই, তা না হোলে কি আপনাকে এ রকম কষ্ট পেতে হয়?

অজর শোভনার কথাগুলো শুনে অতি কষ্টে উঠে খাটে পিঠটা হেলান দিয়ে বল্লে—শোভনা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি অন্যায় হয় তা হোলে ক্ষমা কোরো। আমার ভার নেবে শোভনা? দেখ, সংসার করেছিলুম কিন্তু সংসারের যা সব চেয়ে বড় অভিশাপ তাই আমার মাথায় বাজের মতন এসে পড়্‌ল। তারপর এই ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে যদি কখনো সেরে উঠি তা হোলে আমায় বিয়ে করবে? দেখ—তোমায় আমি জানি—তুমিও আমায় জান—আমরা দু-জনেই বোধ হয় সুখী হতে পারব।

অজর শোভনার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার শুয়ে

পড়্‌ল। তার হাঁপ লেগেছিল, সে একবার জোর নিশ্বাস নিয়ে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেল্লে।

অজরের কথাগুলো শোভনা প্রথমে বুঝতেই পারলে না। সুরা যেমন পানের কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় অপরূপ অনুভূতির সঞ্চার করে অজরের কথাগুলোও তেমনি অতি ধীরে শোভনার শিরায় শিরায় অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। এক ঝলক বাতাস দুরন্ত শিশুর মতন তার কোলে পিঠে লাফালাফি কোরে ছুটে পালিয়ে গেল। জীবনে এই অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। রমেশ তাকে ভাল বেসেছিল বটে কিন্তু এমন কোরে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে নি। শোভনার মনের মধ্যে জাগ্‌তে লাগ্‌ল—ছোট্ট একটি সংসার আশে পাশে দুটী তিনটী ছেলে মেয়ে, তার মধ্যে মহীয়সী রাণীর মতন সে বসে আছে—এই তো জীবনের স্বার্থকতা।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়ে দিয়ে অজর তার একখানা হাত ধরে বল্লে—শোভনা, সংসারে তোমার কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। আমাকে বিয়ে করলে তুমি অসুখী হবে না।

শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল এ দান অগ্রাহ্য করবার শক্তি তার নাই। সুখী হই আর সুখী না-ই হই—আমি চাই নিজের গৃহ, নিজের সন্তান, স্বামী।

শোভনা বলতে যাচ্ছিল—তোমার এ দান আমি মাথা পেতে নিলুম—এমন সময় ঘরের দরজার কাছে শব্দ হোতেই অজর তার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়্‌ল। শোভনা মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে দরজার সামনে নারীমূর্ত্তি। বিস্ময়ে সে বিহ্বল হোয়ে পড়্‌ল। নারীমূর্ত্তি এগিয়ে অজরের মাথার পিছনে খাটখানা ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে অন্য একটা দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

অজর জিজ্ঞাসা করলে—কে এল শোভনা ?

শোভনা বল্লে—বৌদি।

অজর বল্লে—কে ইন্দিরা ?

শোভনা বল্‌লে—হ্যাঁ।

অজর চোখ বুঁজিয়ে ফেল্‌লে।

কয়েক মিনিট এইভাবে কাটবার পর ইন্দিরা আবার ঘরের মধ্যে এসে একখানা চেয়ার টেনে অজরের খাটের ধারে বস্‌ল। সে শোভনার সঙ্গে একটি কথাও বল্‌লে না।

তিন জনের কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। হঠাৎ শোভনা বলে উঠ্‌ল—পণ্ডিতমশাই, আজ তা হোলে যাই, অনেক রাত্রি হয়েচে।

অজর চমকে উঠে বল্‌লে—এঁ্যা যাবে ? আচ্ছা রামেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে শোভনা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

—আট—

সেদিন রাত্রে অজয়ের বাড়ী থেকে ফিরে আসবার পর শোভনা আর ক'দিন সেমুখো হোতে পারলে না। অজয়ের সেই কথাগুলো, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পলাতকা ইন্দিরার আবির্ভাব—সমস্ত ব্যাপারটা তাকে এমন আচ্ছন্ন কোরে ফেলেছিল যে সে আর বাড়ী থেকে বেরুতে পাচ্ছিল না। অথচ অজয়ের কাছে যাবার জন্য মনে মনে সে ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল। শোভনা ভাবছিল—এই ক'বছর ধরে যে কথা শোনবার জন্য তার অন্তরাত্মা উন্মুখ হোয়ে ছিল—কতদিন ঘুমের ঘোরে রমেশের মুখে এই কথা শুনে জেগে উঠে রাত্রি তার বিনিদ্র কেটেচে—সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে অজয়ের মুখে সে কথা শুনে সে বিহ্বল হোয়ে পড়েছিল। পুরুষের মধ্যে এক রমেশের মূর্ত্তিই তার মানস মন্দিরে ধ্যানের বস্তু হোয়েছিল। যদিও সে মূর্ত্তি অদর্শনের অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য হোয়ে এসেচে। অজয় তার স্বামী হোতে পারে অথবা সে তার স্বামী হোলে কেমন হয় এ চিন্তাও শোভনার মনে কখনো উদয় হয় নি। তবুও সেদিন যখন রোগার্ত্ত অজয় তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল তখন তো মুহূর্ত্তের জন্য রমেশের মূর্ত্তি তার মনে আসে নি। তার বুভুক্ষু নারী-হিয়া তখুনি সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। শোভনার মনে হয়েছিল—এই তো স্বর্গ—অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব গিয়ে এই মুহূর্ত্তটাই তার জীবনে স্থায়ী হোক্।

অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই মুহূর্ত্তেই ইন্দিরার আবির্ভাবে তার বিহ্বল হৃদয় যেন মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়েছিল—কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞান তার ছিল না।

বাড়ীতে বসে বসে শোভনা সেদিনকার সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে মনের মধ্যে আলোচনা করতে সুরু কোরে দিলে। ভাবতে ভাবতে সে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল—কোন্ মুখ নিয়ে আবার সে লোক সমাজে বেরুবে। তারপরে লজ্জার প্রথম তরঙ্গ কেটে গেলে সে বিচার কোরে দেখলে যে, এ বিষয়ে তার তো লজ্জার কিছুই নেই। অজর যাই বলে থাকুক না কেন সে তো তার উত্তরে কিছুই বলে নি। ব্যাপারটাকে সে খুব হাল্কাভাবে নেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। এইভাবে আরও কিছুদিন কাটবার পরে সে তার মনের সহজগতি ফিরিয়ে পেল।

একদিন বিকেলে শোভনা মন বেঁধে অজরদের বাড়ীর দিকে বেরিয়ে পড়্‌ল। সে গিয়ে দেখলে অজর বারান্দায় ইজিচেয়ারে একলা বসে রয়েচে। অজর তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে—কি শোভনা এ ক'দিন সেই থেকে তোমায় আর দেখিনা যে?

অজরের কথার ইঙ্গিতে শোভনার মুখ লজ্জায় লাল হোয়ে উঠ্‌ল। সে পেছন ফিরে একটা চেয়ার টেনে এনে বসতে বসতে বল্লে—ক'দিন ভারি কাজের তাড়া পড়েছিল—বৌদি কোথায়?

অজর বল্লে—ইন্দিরা দুপুরে সমরদের বাড়ী গিয়েছে, সন্ধ্যার আগেই আসবে বলে গেছে।

শোভনা অত্যন্ত সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলে—বৌদি এতদিন কোথায় ছিলেন?

অজর বল্লে—তা তো জানি না।

তারপর একটু মৌন থেকে বল্লে—আমিও জিজ্ঞাসা করিনি আর সেও কিছু বলেনি। কেন বল তো?

অজরের এই শেষের প্রশ্নে শোভনা বিব্রত হোয়ে পড়্‌ল। সে কোনো

চিন্তা না কোরেই বলে ফেল্লে—আমাকে একবার কলকাতায় যেতে হবে—তাই—

অজয় জিজ্ঞাসা করলে—কলকাতায় তোমার কে আছেন ?

—কেউ নেই পণ্ডিত মশাই। আমার খানিকটা জামার কাপড়ের দরকার। এখানে ভাল কাপড় কিছু পাওয়া যায় না। বৌদি জানেন কোথায় পাওয়া যায় তাই।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে শোভনা বল্লে—আপনার সেই সুষমাকে মনে আছে পণ্ডিত মশাই ? সেই ফার্ষ্ট ইয়ারে যার বিয়ে হোয়ে গেল।

অজয় একটু ভেবে বল্লে,—সেই শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা—

শোভনা বল্লে—হ্যাঁ সেই যে বড্ড হাস্‌ত। জিনিষ কিনতে আর কতক্ষণই বা লাগ্‌বে, বাকি সময়টা তার ওখানে কাটাব।

ইতিমধ্যে ইন্দিরা এসে উপস্থিত হোলো। সে শোভনাকে জিজ্ঞাসা করলে—কতক্ষণ আসা হয়েছে ?

শোভনা বল্লে—এই খানিকক্ষণ।

অজয় বল্লে—শোভনা এসেই তোমার খোঁজ করছিল। ও কতকগুলো কি কাপড় কিনতে কলকাতায় যাবে তাই তোমার পরামর্শ চাই।

কলকাতার নাম শুনে ইন্দিরা উৎসাহিত হোয়ে একটা চেয়ার টেনে এনে বসে বল্লে—কলকাতায় যাবেন ! কবে ?

শোভনা বল্লে—যাবার তো ইচ্ছা আছে কিন্তু কেউ সঙ্গী বা সঙ্গিনী না পেলে একলা যাই কি কোরে ? আমি তাই পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, আপনি তো প্রায়ই যান, তা এবার যখন যাবেন সেদিন দয়া কোরে যদি আমাকেও সঙ্গে নেন।

ইন্দিরা বল্লে—বেশ তো। আমার বোধ হয় শীগ্‌গীরই একবার কলকাতায় যেতে হবে।

শোভনা বল্লে—আমাকে কিন্তু যেদিনে যাব সেদিনই ফিরতে হবে।

ইন্দিরা শোভনার কথার কোনো জবাব দিলে না। তাকে চুপ কোরে থাকতে দেখে শোভনা আবার বল্লে—আমার তো এখন ছুটী নেই, তার ওপরে সেখানে গিয়ে থাকবার জায়গাও নেই।

ইন্দিরা বল্লে—বেশ এবার যেদিন যাব আপনাকে আগে খবর দেব।

কয়েকদিন পরে ইন্দিরা শোভনাকে বল্লে—কাল কলকাতায় যাব মনে করচি—আপনার স্থবিধা হবে?

শোভনা বল্লে—কাল তা হোলে আমাকে ছুটী নিতে হয়। আচ্ছা কটার সময় ট্রেণ?

ইন্দিরা বল্লে—সকাল সাড়ে আটটায় একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী আছে। সেখানা গিয়ে পৌছায় বেলা সাড়ে দশটায়। আপনি আটটার মধ্যে আমাদের এখানে আসবেন, তা হোলেই হবে।

শোভনা বল্লে—কিন্তু কালই আমায় ফিরতে হবে।

ইন্দিরা বল্লে—হ্যাঁ কালই ফিরব।

স্কুলে একদিনের ছুটি নিয়ে পরদিন শোভনা সকাল আটটার মধ্যে অজয়দের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হোলো। ইন্দিরা প্রস্তুত হয়েই বসেছিল, সে আসা মাত্র তারা বেরিয়ে পড়্‌ল। রামেশ্বর তাদের ষ্টেশন অবধি পৌছে দিয়ে গেল।

দু-খানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে ইন্দিরা ও শোভনা ট্রেণের একটা খালি কামরায় উঠে বস্‌ল। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছেড়ে দিলে।

ইন্দিরা ও শোভনা দু-জনের কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। ইন্দিরা জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বার কোরে দেখতে লাগ্‌ল আর শোভনা এক জায়গায় বসে একদৃষ্টে ইন্দিরার দিকে চেয়ে রইল।

ইন্দিরার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হোতে লাগ্‌ল আশ্চর্য্য রহস্যময়ী এই নারী। এর কিছুই কি বোঝবার উপায় নেই। সে ভাবতে লাগ্‌ল কেন ইন্দিরা কলকাতায় যাচ্ছে! সেখানে নিশ্চয় তার কোনো ভালবাসার পাত্র আছে। তারই সঙ্গে দেখা করবার জন্য সে এত ঘন ঘন কলকাতায় যায়। সেই যে চার পাঁচ মাস সে অদৃশ্য হয়েছিল—সে সময়টা নিশ্চয়ই ইন্দিরা তার কাছেই কাটিয়েছে। কথাটা মনে হোতেই শোভনার অজয়ের কথা মনে হোলো, সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রের কথা—ইন্দিরার ওপর রাগ ও ঘৃণায় তার মনটা বিষিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ গাড়ীর মধ্যে মুখ ফিরিয়েই ইন্দিরা শোভনার দিকে তাকালে। শোভনা দেখলে তার দুই চোখে অশ্রু টলটল করচে। ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা আপনাদের দেশ কোথায়?

শোভনা বল্লে—আমাদের দেশ ছিল বর্দ্ধমানের কোন্ এক জায়গায়। বাবা দেশ ছেড়ে দিয়ে কলকাতাতেই বাস করতেন। আমার জন্ম কর্ম্ম সবই কলকাতায়। দেশ কখনো চোখেও দেখিনি, সেখানকার কারুকে চিনিও না।

ইন্দিরা চুপ কোরে রইল। একটু পরে শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—আপনাদের দেশ কোথায়?

ইন্দিরা বল্লে—কলকাতায়। তিন চার পুরুষ আগে অন্য কোথাও ছিল নিশ্চয়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর ইন্দিরা বল্লে—কে জান্‌ত যে আমাদের জীবন ঐ পাড়াগাঁয়ে এমন ভাবে কাটবে।

কথাটা শুনে শোভনার এক সঙ্গে অনেক কথাই মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার বাবা-মার কথা, রমেশের কথা, স্কুল কলেজের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরার প্রতিও সহানুভূতিতে ধীরে ধীরে তার মনটা আর্দ্র হোয়ে

উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যখন হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, তখন ট্রেণ থেকে নেমে ইন্দিরা শোভনাকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

শোভনা মনে করেছিল যে ইন্দিরা যেখানে যাচ্ছে তাকেও সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেদিক থেকে কোনো আমন্ত্রণ না আসায় সে একটু বি[illegible]ত হোয়ে পড়্‌ল।

শোভনাকে নীরব দেখে ইন্দিরা একটু একটু কোরে অগ্রসর হোতে লাগ্‌ল। শোভনাও ধীরে ধীরে তার সঙ্গে এগিয়ে চল্‌ল। ষ্টেশন পার হোয়ে তারা গাড়ীর আড্ডার কাছে এসে দাঁড়াল। ইন্দিরা আবার জিজ্ঞাসা করলে—কোন্‌দিকে যাবেন?

শোভনা এবার বল্লে—আমি একবার মার্কেটে যাব—সেখানে কতকগুলো জিনিষ কিন্‌তে হবে। সেখান থেকে বালীগঞ্জে যাব একটী বন্ধুর বাড়ীতে।

ট্যাক্সির ভেঁপু ও গাড়োয়ানদের চীৎকারে সেখানে ভীষণ একটা হট্টগোল চলেছিল। ইন্দিরা একবার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বস্‌ল। তারপর মুখ বাড়িয়ে শোভনাকে বল্লে—সাতটা বাইশ মিনিটে গাড়ী, আমি সওয়া সাতটা নাগাদ ষ্টেশনে এসে পৌছব।

তার পর ট্যাক্সিচালককে হুকুম দিলে—যাও। ভোঁ কোরে গাড়ীখানা সামনের দিকে ছুটে চলে গেল আর শোভনা হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

শোভনা দেখলে ইন্দিরার গাড়ীখানা হাওড়া পুলের ওপরে গিয়ে উঠ্‌ল। সে যে এমন ভাবে তাকে একলা ফেলে যাবে এ কথা শোভনার একবারও মনে হয় নি। ইন্দিরার গাড়ীখানা অদৃশ্য হোয়ে যেতেই তার মনে

হোলো এখানে এসে সে ভাল করেনি। তার পরে সে তার মনে হোলো এখন যাই কোথায়? একবার সে ভাবলে রমেশদের বাড়ীতে গেলে কেমন হয়! কিন্তু তখুনি তার মনে হোলো এতদিন পরে কোনো খবর না দিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলে তারা কিছু মনে করতে পারে। রমেশরা সেই বাড়ীতে আছে কিনা তারই বা ঠিক কি! হয়ত তারা এখন সায়েব পাড়ায় থাকে। শেষকালে সে ইন্দিরাকে যা বলেছিল তাই করাই ঠিক করলে। কাছেই একখানা ফিটন গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, গাড়োয়ানকে ডেকে গাড়ীতে চড়ে বসে সে বল্লে—যাও—নিউ মার্কেট।

নিউ মার্কেটে নেমে দুই ঘণ্টা ধরে সে তার বাজার করিল তারপর সে ফিরে এসে গাড়ীতে বসে কলিকাতার সহর দেখিতে আরম্ভ করিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল।

হঠাৎ ঘড়িতে সাতটা বেজেছে দেখে তার মনে পড়্‌ল ইন্দিরা তাকে সাতটার মধ্যেই ষ্টেশনে আসতে বলেছিল। সে তাড়াতাড়ি একখানা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে বল্লে—যাও, হাওড়া ষ্টেশন।

ষ্টেশনে এসে শোভনা দেখলে ইন্দিরা তার আগেই এসে পৌঁচেছে। তারা দুজনে গিয়ে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা দখল কোরে নিয়ে বস্‌ল। গাড়ীতে উঠেই ইন্দিরা বল্লে—আমার এক মাসতুত ভাইয়ের ওখানে গিয়েছিলুম। তারা কিছুতেই আসতে দিতে চায় না। আপনাকে কথা দিয়েছি না হোলে আজ আর ফিরতুম না।

শোভনা বল্লে—আপনাকে বড় কষ্ট দিলুম, আমায় ক্ষমা করবেন।

ইন্দিরা তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে হাতের ব্যাগটা নিয়ে অন্য দিকের বেঞ্চিখানার এক কোণে রাখলে। তারপরে ফিরে এসে ষ্টেশনের দিকের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই গাড়ী ছেড়ে দিলে। গাড়ী ছাড়তেই আবার ইন্দিরা গিয়ে ওদিককার বেঞ্চিতে বস্‌ল।

শোভনা বল্লে—আমারও আরও দু-একদিন থাকবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু থাকি কোথায়? এখানে আমার তো কেউ নেই!

ইন্দিরা বল্লে—কেন কোন হোটেলে গিয়ে তো উঠ্‌তে পারেন!

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—মেয়েরা একলা থাকতে পারে এমন কোনো হোটেল আছে?

ইন্দিরা অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে বল্লে—যথেষ্ট।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—আপনার জানাশোনা কোন হোটেল আছে?

ইন্দিরা শোভনার কথার কোনো জবাব দিলে না। শোভনার মনে হোলো বোধ হয় সে তার কথাটা শুনতে পায় নি। প্রশ্নটা আবার করবে কিনা ভাব্‌ছে এমন সময় ইন্দিরা বল্লে—আমি একটা হোটেল জানি, সেখানকার ঘরগুলোও ভাল, দরও সস্তা।

শোভনা বল্লে—ঠিকানাটা যদি আমায় দেন তা হলে বড় ভাল হয়—যদি আবার কখনো আসি।

ইন্দিরা তার ব্যাগ খুলে একটুক্‌রা কাগজ বের কোরে তাতে হোটেলের নাম ও ঠিকানা লিখে দিলে। শোভনা পড়্‌লে—Miss Fancy's Apartments.

ইন্দিরা বল্লে—আগে থাকতে চিঠি লিখলে লোক গিয়ে ষ্টেশন থেকে আপনাকে নিয়ে আসবে।

শোভনা কাগজখানা যত্ন কোরে মুড়ে রেখে দিলে। অন্ধকার রাত্রির বুক ফুঁড়ে ট্রেনখানা হু হু কোরে ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

শোভনা বাইরের সেই রহস্যময় ঘন অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। তার মনের মধ্যে অনেক বিস্মৃত কাহিনীর এক একটা টুক্‌রা এসে জমা হোতে লাগ্‌ল। নিজের অজ্ঞাতে কতবার তার চোখ জলে ভরে উঠ্‌ল,

কতবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অতীতের চিন্তা ক্রমে বর্ত্তমানে এসে দাঁড়াল, বর্ত্তমানের চিন্তা আবার ভবিষ্যতে প্রসারিত হোলো। হঠাৎ একবার চমক্ ভাঙতেই সে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে যে তাদের ষ্টেশনে পৌঁছবার সময় প্রায় হোয়ে এসেছে।

ষ্টেশনে রামেশ্বর তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে শোভনাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। বাড়ীতে এসে কাপড় চোপড় বদলে সে ঘরের বাইরের ছাতে একখানা ইজি চেয়ার নিয়ে তার ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলে।

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। দূরে মল্লিকদের খিড়্কীর বাগানের পাশাপাশি দুটো নারকোল গাছ আবছায়ার মতন দেখা যাচ্ছে। মাথার ওপরে নিঃসীম নীলাকাশ। শব্দহীন জগৎ যেন ছুটতে ছুটতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। শোভনা ভাবতে লাগ্ল, কলকাতায় আর সে কখনো যাবে না। সেখানে তার কে আছে! কি করতে সে সেখানে যাবে! ইন্দিরার দেখাদেখি তারও সেখানে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু যে আকর্ষণ তার তো তা নেই। তার মনে হোতে লাগ্ল ইন্দিরার নারীজন্ম সার্থক। তার স্বামী তাকে গৃহে ধরে রাখতে চায়, সেখানে থেকে ছুটে যায় সে প্রণয়ীর কাছে। সে তাকে বাঁধতে চায় সে ছুটে আসে স্বামীর কাছে। ইন্দিরার ওপরে তার হিংসা হোতে লাগ্ল।

শোভনা তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে লাগ্ল। হয়ত এইখানে চিরদিন তাকে এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হোয়েই কাটাতে হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই তো মাথার চুলে পাক ধরবে, মুখের মাংস লোল হোয়ে পড়্বে—রাস্তা দিয়ে হাঁটলে ফিরেও কেউ তার মুখের দিকে তাকাবে না।

—নয়—

সেদিন দুপুর বেলা ঘরের মধ্যে বসে বসে শোভনা ভাবছিল গ্রীষ্মের ছুটিটা কি কোরে কাটান যায়। বাবা মার মৃত্যুর পর দেওঘরে যাঁরা শোভনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে তার পত্র-বিনিময় চল্‌ত। কিছুদিন থেকে তাঁরা তাকে দেওঘরে যাবার নিমন্ত্রণ করছিলেন। শোভনা মনে মনে দেওঘরে যাবার একটা হিসাব করছিল এমন সময় ঘরের মধ্যে ইন্দিরা এসে ঢুকল।

ইন্দিরা যে কখনো তার ঘরে আসবে এ কথা শোভনা কল্পনাও করতে পারেনি। এই মেয়েটীকে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে বাঁধবার জন্য শোভনা কত চেষ্টাই না করেচে কিন্তু সে কখনো তার কাছে ধরা দেয় নি। আজ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ইন্দিরাকে তার কাছে আসতে দেখে শোভনা মনে প্রাণে খুশী হোয়ে উঠ্‌ল।

শোভনা ইন্দিরাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে খাটে বসে বল্লে—আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম। আপনি আমার ঘরে আসবেন এ আমার কল্পনার অতীত।

ইন্দিরা একটু হেসে বল্লে—কল্পনার অতীত জিনিষও মাঝে মাঝে বাস্তবে পরিণত হয়।

ইন্দিরার কথাগুলো শুনে শোভনার উৎসাহের মাত্রা অনেকখানি হ্রাস হোয়ে গেল। তবুও সে খুশীর অভিনয় কোরে বল্লে—এদিকে কোথাও এসেছিলেন বুঝি?

ইন্দিরা বল্লে—কেন আপনার কাছে কি আস্‌তে নেই?

শোভনা হেসে ফেলে বল্লে—আমি তো তাই মনে করেছিলুম। কৈ কখনো তো আসেন না। যাক্ Better late than never.

ইন্দিরা বল্লে—একটু স্বার্থও আছে, একেবারে নিঃস্বার্থভাবে আসিনি।

শোভনা একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে বল্লে—কি স্বার্থ বলুন দিকিনি?

ইন্দিরা বল্লে—কাল আমি কলকাতায় যাচ্ছি। আপনি যাবেন?

শোভনা বল্লে—আমি যে দেওঘরে যাবার ঠিক কর্‌ছি।

ইন্দিরা গম্ভীর হোয়ে বল্লে—ও তাই নাকি! কবে যাবেন?

শোভনা বল্লে—যাই তো কাল পরশু নাগাদ রওনা হব।

ইন্দিরা সেই রকম গম্ভীর হোয়েই জিজ্ঞাসা করলে—কবে ফিরবেন?

শোভনা বল্লে—গরমের ছুটিটা সেইখানেই কাটিয়ে আস্‌ব মনে করছি।

ইন্দিরা আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হোয়ে বসে থেকে বল্লে—দেখুন আজ আপনার কাছে এসেছি কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে সে কথা আর কারুকে আপনি বলবেন না।

ইন্দিরার কথাবার্ত্তা শুনে শোভনা দস্তুর মতন ভড়কে গেল। কি এমন গোপনীয় কথা সে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে মনের মধ্যে তাই তোলাপাড়া করতে লাগ্‌ল।

তাকে চুপ কোরে থাক্‌তে দেখে ইন্দিরা একটু হেসে বল্লে—তবে কি আমি বুঝব যে আপনি আমার কথাগুলো গোপন রাখতে পারবেন না।

ইন্দিরার কথা শুনে শোভনার চমক ভাঙ্‌ল। সে বলে উঠ্‌ল—না না—তা কেন?

তারপরে একটু নিশ্বাস নিয়ে সে বল্লে—দেখুন আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। আমার তো কেউ নেই, আপনাদেরই আমি নিজের বলে জানি। আপনার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কি দোষে জানিনা আপনি আমায় দূরে ঠেলে দিয়েছেন। আপনাদের গোপন কথা—সে তো আমারও গোপন কথা। আপনি আমায় বন্ধু বলেই মনে করবেন।

শোভনার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করতে লাগ্‌ল। ইন্দিরা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে—আপনাকে আমি যা বলতে চাইচি তা আমাদের গোপন কথা নয়—আমার গোপন কথা সেগুলো।

শোভনা বল্লে—আপনি অসঙ্কোচে বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করচি, আপনার কাছ থেকে যা শুনব তা অন্যলোকে জানতে পারবে না।

ইন্দিরা আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে রইল। তার পরে হঠাৎ বলে ফেল্লে—আপনি আমার স্বামীকে ভালবাসেন?

শোভনার মনে হোলো যেন ছাত থেকে একখানা কড়িকাঠ খসে তার মাথার ওপরে পড়্‌ল। সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ কোরে আঁচলে মুখখানা ঢেকে ফেল্লে। কিন্তু তখুনি সে আঁচলখানা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে সোজা ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে তার চোখ দুটো উল্লাসে যেন জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে। শীকারকে করতলগত করতে পারলে পশুর চোখে যে আনন্দের দীপ্তি ফুটে ওঠে এ যেন তাই। তার দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার প্রতি ঘৃণায় শোভনার অন্তর জর্জ্জরিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একবার শোভনার মনে হোলো ইন্দিরা এতদিন ধরে তাকে যে অবজ্ঞা ও ঘৃণা দেখিয়ে এসেচে আজ তার সেই সমস্ত ব্যবহারের প্রতিশোধ নিয়ে বলে—হ্যাঁ ভালবাসি! কিন্তু সে-ও নারী! তার তখুনি মনে হোলো যে এ কথার সঙ্গে সঙ্গে তো ইন্দিরার সমস্ত প্রশ্নেরই সমাধান হোয়ে যাবে।

প্রতিশোধ নেবার সেই দুষ্ট বাসনাকে কোনোরকমে সংযত কোরে শোভনা বল্লে—দেখুন, আমার গোপন কথা আপনার কাছে প্রকাশ করবার প্রতিজ্ঞা তো আমি করিনি।

ইন্দিরা শোভনার কাছ থেকে এমন জবাব পাবার প্রত্যাশা করে নি। এতদিন সে তাকে অবহেলাই কোরে এসেছিল। সে মনে মনে স্বীকার করলে শোভনার কাছে তার পরাজয় হোলো।

শোভনা আবার একটা নতুন আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মনের মধ্যে ব্যূহ রচনা করেছিল ইতিমধ্যে ইন্দিরা আবার প্রশ্ন করলে—আচ্ছা আমার স্বামী আপনাকে ভালবাসেন ?

এক মুহূর্ত্ত অবসর না নিয়ে শোভনা উত্তর দিলে—সে কথা আপনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবেন।

ইন্দিরা বল্লে—দেখুন আমার স্বামীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

ইন্দিরা এই অবধি বলেই চুপ করলে। উৎকণ্ঠায় শোভনার গলা শুকিয়ে কাঠ হোয়ে উঠ্‌ল। সে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—তিনি কি বল্লেন ?

ইন্দিরা একটু হেসে বল্লে—আপনি যেমন কথার প্যাঁচে উত্তরটা চাপা দিলেন তিনিও তাই করলেন।

শোভনা আর কোনো প্রশ্ন করলে না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে ইন্দিরা তার চেয়ে বুদ্ধিমতী। কয়েক মুহূর্ত্ত আগে জয়ের আনন্দ ও গর্ব্বে তার মন স্ফীত হোয়ে উঠেছিল কিন্তু ইন্দিরার এই শেষ কথায় তার মনে হোলো—তার সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে।

ইন্দিরাও কোনো কথা বল্লে না। তার সুন্দর মুখখানা ঘিরে একটু হাসি ফুটে উঠ্‌ছিল। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল সে যেন সমস্ত সংসারের প্রতি দারুণ অবজ্ঞা ও পরিহাসের হাসি। সে হাসি যেন প্রকাশ

করতে চায় যে, স্বামী অন্য স্ত্রীতে অনুরক্তা হোক তা সে গ্রাহ্য করে না। অতি দুর্দ্দিনেও সে সম্ভ্রমের উচ্চশিখরে দাঁড়িয়ে জানাতে চায় যে তোমাদের চেয়ে আমি এখনো অনেক ওপরে—তোমাদের নিক্ষিপ্ত কর্দ্দম আমার অঙ্গে পৌঁছবে না।

শোভনা একদৃষ্টে ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাকে দেখতে দেখতে তার আবার মনে হোলো ইন্দিরা সত্যিই সুন্দরী। শোভনার ইচ্ছা হোতে লাগ্‌ল ইন্দিরার দুই গালে দুই চুমু দিয়ে বলে যে, কোনো ভয় নেই তোমার—আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না—আমাকে বিশ্বাস কর।

ইন্দিরা ঘাড় নীচু কোরে বসে কি যেন ভাবতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ পরে শোভনা হেসে বল্লে—বৌদি আপনার কোনো ভয় নেই, আপনার রত্নটিকে কেড়ে নেবার কোনো মতলব আমি করিনি।

ইন্দিরা যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর হোয়ে বসেছিল। শোভনার কথাগুলো কাণে যেতেই সে চম্‌কে উঠে বল্লে—এঁ্যা!

তারপরে একটু হেসে ইন্দিরা আবার ঘাড় নীচু করলে—অতি ম্লান হাসি সে।

দ্বিপ্রহরের জ্বলন্ত সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়্‌ল। নদীর ধারের জান্‌লাটা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে ইন্দিরার গায়ের ওপরে পড়্‌তেই শোভনা উঠে গিয়ে জান্‌লাটা বন্ধ কোরে দিলে।

আবার নিস্তব্ধ, কারুর মুখে কোন কথা নেই। শোভনার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হোতে লাগ্‌ল। ইন্দিরার হাবভাব ও মুখ দেখে সে বুঝতে পারলে সে যেন তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। কি কথা জিজ্ঞাসা করতে চায় সে! কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে শোভনার ভয় হোতে লাগ্‌ল।

আরও কিছুক্ষণ এই রকম অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিয়ে শোভনা বল্লে—বৌদি একটু সরবৎ করব খাবেন ?

ইন্দিরা মুখ তুলে শোভনার দিকে একটু হাসলে। সেই রহস্যময় হাসি ! তারপর বল্লে—না থাক।

শোভনা মিনতির সঙ্গে বল্লে—খান না একটু সরবৎ, আমার বাড়ীতে তো কখনো আসেন না—আজকে যদি এসেছেন তো অম্‌নি ছাড়্‌চি না।

ইন্দিরা এবার বল্লে—আচ্ছা করুন।

শোভনা তখ্‌নি ঝিকে ডেকে বরফ আনতে পাঠালে। তারপর আলমারি খুলে কমলা লেবুর সিরাপ ও কাচের গেলাস বার কোরে সরবৎ তৈরী করতে লাগ্‌ল।

ইন্দিরার হাতে একটী গেলাস দিয়ে শোভনা নিজের গেলাস নিয়ে বিছানায় গিয়ে বস্‌ল।

ইন্দিরা গেলাসটা তুলে তাতে একটি ছোট্ট চুমুক দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রেখে বল্লে—আপনি যদি আমার স্বামীকে ভালবাসেন এবং তিনিও যদি আপনাকে ভালবাসেন তা হোলে আপনাদের মিলন হওয়াটাই কি বাঞ্ছনীয় নয় ?

আবার সেই কথা ! শোভনার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। সে যে কি জবাব দেবে তা ভেবে ঠিক করতে পারলে না। ইন্দিরা গেলাসে আবার একটা চুমুক দিয়ে বল্লে—আপনি কোনো সঙ্কোচ করবেন না। আমার স্বামীকে ভালবাসার জন্য আপনাকে আমি কোনো দোষ দিচ্ছি না। এতে আপনি অন্যায় কিছু করেন নি। তিনিও আপনাকে ভাল বেসেছেন বলে কোনো অন্যায় করেন নি। যে কোনো পুরুষ যে কোনো নারীকে ভালবাসতে পারে এবং যে কোনো নারী যে কোনো পুরুষকে ভালবাসতে পারে ! দুজনে যদি দুজনের প্রতি অনুরক্ত হয় তা হোলে তাদের মিলন

হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হয়ত হোতে পারে আমার বিয়ের আগেই আপনাদের উভয়ের মধ্যেই ভালবাসা জন্মেছিল।

শোভনার মুখ দিয়ে একটী কথাও বেরুলো না। তার মনে হোতে লাগ্‌ল যেন তার বাক্‌শক্তি রহিত হোয়ে গেছে। ইন্দিরা তার গেলাস তুলে বাকি সরবৎটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ কোরে গেলাসটা নামিয়ে রেখে বল্লে—কি আপনি সরবৎ খাচ্ছেন না?

শোভনা বল্লে—এই যে খাচ্ছি—

নিজের স্বর শুনে শোভনা নিজেই চম্‌কে উঠ্‌ল। সেও এক চুমুকে সমস্ত সরবৎটুকু পান কোরে মেঝেতে গেলাস নামিয়ে রাখলে।

ইন্দিরা বল্লে—আমার কথাগুলো শুনে আপনি ভয়ানক আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছেন, না?

শোভনা হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বল্লে না। পরম বিস্ময়ে শুধু সে ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ইন্দিরা আবার বলতে লাগ্‌ল—দেখুন মানুষ তো আর কল নয়। অর্থাৎ কাপড়ের কলে ময়দা পেষা কখনো হোতে পারবে না। আমাকে বিয়ে করার পরেও আমার স্বামীর মন আপনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটাও খুব অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। এবং তা যদি হোয়ে থাকে তাতে তাঁর অন্যায়ও কিছু হয়নি কারণ আমি তাঁকে কখনো ভালবাসতে পারিনি।

ইন্দিরা এই অবধি বলে চুপ করলে। শোভনাও আগের মতন চুপ কোরে বসে রইল। তার কানে ইন্দিরার শেষ কথাগুলো তখনো ঝন্ ঝন্ কোরে বাজ্‌তে লাগ্‌ল—আমি তাঁকে কখনো ভালবাসতে পারিনি।

ইন্দিরা যে তার স্বামীকে ভালবাসে না সে কথা শোভনার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। তার জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হোতে লাগ্‌ল—

আপনি কাকে ভালবাসেন? কিন্তু সে অদম্য কৌতূহল চেপে শোভনা বল্লে—কিন্তু বিয়ের পর অন্য কারুকে ভালবাসা কি উচিত বৌদি?

ইন্দিরা আবার একটু হেসে বল্লে—উচিত কি অনুচিত তা বলতে পারি না। কিন্তু বিয়ে জিনিষটা তো আর ভালবাসার টিকে নয়।

শোভনা এ কথার কোনো জবাব দিলে না। ইন্দিরা আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে—দেখুন আপনাকে যে কথাটা বলতে এসেছিলুম তা এখনো বলা হয়নি।

শোভনা অত্যন্ত হতাশার স্বরে বল্লে—বলুন।

ইন্দিরা বল্লে—আমি যদি আপনাদের মিলনের পথে অন্তরায় হোয়ে থাকি তা হোলে আপনি আমায় নিঃসঙ্কোচে বলুন—আমি আপনাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। আপনি কোনো সঙ্কোচ করবেন না—সরল ভাবে বলুন।

শোভনা এবার নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে বসে একেবারে ইন্দিরাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে উঠ্‌ল—বৌদি দোহাই আপনার! কি একটা মিথ্যা অনুমানের ওপর নির্ভর কোরে আপনি নিজের ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বামীর জীবনটা নষ্ট করতে বসেছেন। আপনার স্বামীকে আমি ভালবাসি না, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তিনিও আমায় ভালবাসেন না—আপনার মতন সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে কোন্ পুরুষ অন্য নারী চায়! আপনি স্বামীকে ভালবাসতে চেষ্টা করুন! তাঁর মতন লোক সংসারে দুর্ল্লভ। তাঁকে সুখী করুন আপনিও সুখী হবেন। আপনাদের বিবাহিত জীবন সার্থক করুন। অনেক পুণ্যের ফলে আপনি এমন স্বামী পেয়েছেন।

শোভনা চোখের জল মুছতে মুছতে আবার এসে বিছানায় বসে পড়্‌ল। সে দেখলে ইন্দিরার দু-চোখে দু-ফোঁটা জল টল্‌টল্ করছে।

ইন্দিরা আর কোনো কথা না বলে চুপ কোরে বসে রইল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর শোভনা উঠে গিয়ে পাশ্চিম দিকের জানালাটা খুলে দিলে। সূর্য্য তখন দিগন্তে একেবারে ঢলে পড়েছে। অস্তমান সূর্য্যের একটুখানি লাল আভা শোভনার ঘরের মধ্যে এসে পড়্‌ল।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কবে কলকাতা থেকে ফিরবেন ?

ইন্দিরা বল্লে—শীগ্‌গীরই ফিরব।

ইন্দিরার মনটাকে একটু সুখী করবার জন্য শোভনা বল্লে—আপনার সঙ্গে কলকাতায় যেতে বড় ইচ্ছা করছে কিন্তু দেওঘরে যাবার ব্যবস্থা যে কোরে ফেলেছি। আবার যখন যাবেন তখন নিশ্চয় সঙ্গে যাব।

ইন্দিরা কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে—আর বোধ হয় আমি কলকাতায় যাব না।

শোভনা দেখলে যে দু-ফোঁটা জল এতক্ষণ ইন্দিরার দুই চোখে টল্ টল্ করছিল সে দু-ফোঁটা তার চোখ উপ্‌চে গালে ঝরে পড়েছে।

ইন্দিরাকে কাঁদতে দেখে শোভনার বড় দুঃখ হোলো। কিন্তু কি সহানুভূতি জানাবে সে ? কিসের দুঃখ তার কিছুই সে জানে না। সে বিষণ্নমুখে ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল আর ইন্দিরার দুই গাল বয়ে নিঃশব্দে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে উঠ্‌ল। ওপারের কলগুলো কিছুক্ষণ ধরে একঘেয়ে একটানা সুরে ছুটীর বাঁশী দিয়ে চুপ করলে। নিস্তব্ধ সেই সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারের সেই ঘরটীতে বসে একটী নারী নিঃশব্দে তার বুকের ব্যথা ঝরিয়ে দিতে লাগ্‌ল আর একটি নারী মৌন বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটবার পর শোভনা তার ঝিকে ডেকে ঘরের

মধ্যে আলো দিতে বল্লে। ঝি এসে আলো দিয়ে যাবার পর ইন্দিরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—আচ্ছা, আমি যাই।

শোভনা বল্লে—চলুন আপনাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ইন্দিরা অগ্রসর হোতে হোতে বল্লে—থাক্, আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন!

শোভনা ইন্দিরাকে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে এল। এতক্ষণ ইন্দিরার কথাগুলো সে ভালো কোরে চিন্তা করবার অবসর পায়নি। ইন্দিরা চলে যাবার পর শোভনার প্রথমেই মনে হলো, আশ্চর্য্য নারী এই ইন্দিরা! কিন্তু কেন যে সে এতদিন পরে তার স্বামী সম্বন্ধে তাকে এই সব প্রশ্ন করে তার কোনো কূল কিনারা সে ভেবে পেলে না। সে যে শোভনাকে ও নিজের স্বামীকে সন্দেহ করে তা তার প্রশ্নেই প্রকাশ। কিন্তু স্বামীর ভালবাসা পাবার জন্য কোনো দিনই তো ইন্দিরা কোনো রকম আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বরং সে স্বামীকে অবহেলাই কোরে এসেছে। আজ সেই স্বামীর সুখের জন্য এত বড় ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে কেন? শোভনা ভেবে চিন্তে কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

ভাবতে ভাবতে তার মনে হোলো, হয়ত ইন্দিরা যাকে ভালবাসে সে তাকে এখান থেকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে চায়। যাবার আগে কোনো রকম একটা ছলনা কোরে সরে পড়্তে চায়। ইন্দিরার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। শোভনার আবার মনে হোলো, রহস্যময়ী নারী এই ইন্দিরা!

চিন্তার ঘূর্ণিপাকে পড়ে শোভনা হাবুডুবু খেতে লাগ্ল। কিসের অনুপ্রেরণায় ইন্দিরা এমন সংসার ছেড়ে অনির্দ্দিষ্ট জীবনপথে বেরিয়ে পড়্তে চায়! ভাবতে ভাবতে শোভনার মনে হোতে লাগ্ল হয়ত সে গোড়া থেকেই ইন্দিরাকে ভুল বুঝেছে। হয়ত সত্যিই সে তার স্বামীকে

ভালবাসে। ইন্দিরা বিয়ের দিন থেকেই শোভনার নাম শুনেছে। এমনও হোতে পারে যে তখন থেকেই তার মনে স্বামীর প্রতি সন্দেহের বীজ রোপিত হয়েছে। তার পরে শোভনা নিত্য তাদের বাড়ীতে গিয়েছে। ইন্দিরা তার প্রতি অবহেলার ভাব দেখিয়েছে তা সত্বেও সে তাদের বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করেনি। এতে তার সন্দেহ দিনে দিনে বেড়েই উঠেছে। এই নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীতে মনান্তরও হয়েছে নিশ্চয়! তার পরে সেই রাত্রি! যেদিন অজর তাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল—সেই মুহূর্ত্তেই ইন্দিরার আবির্ভাব! অজর যে তার হাত ধরেছিল তা বোধ হয় ইন্দিরার দৃষ্টি এড়ায় নি। সর্ব্বনাশ! এই সামান্য কথাটা এতদিন সে বুঝতে পারে নি কেন?

শোভনা স্পষ্ট বুঝতে পারলে স্বামীর পর অভিমান কোরেই ইন্দিরা চলে গিয়েছিল ও এখনও চলে যেতে চায়। ইন্দিরার অশ্রুজলের উৎস যে কোথায় এতক্ষণে শোভনার মনে সেটা জ্বল্‌জ্বল্‌ কোরে ফুটে উঠ্‌ল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল যে এতদিন কেন এই কথাটা তার মনে হয়নি। ছি ছি ছি ছি—শোভনার মাথা ঠুকে মরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল।

শোভনা ভাবতে লাগ্‌ল নিজের অনিচ্ছাসত্বেও এই যে একটি পরিবারের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে এ থেকে কি কোরে সে তাদের রক্ষা করবে। সে তখুনি স্থির কোরে ফেল্লে যে, সে-ই তাদের চোখের সামনে থেকে দূরে চলে যাবে। দেওঘরে তারা এখনো উপযুক্ত লোক পায় নি। সেখানে গিয়ে আবার সে চাকরী নেবে। সেখানে যদি চাকরী না জোটে তবুও সে ফিরে আস্‌বে না। এই ক'বছরে তার কয়েক শো টাকা জমেছিল সেই টাকায় তার কিছুদিন চল্‌বে। ততদিনে অন্য কোনো জায়গায় চাকরী জুটিয়ে নিতে পারবে।

শোভনা ভাবতে লাগ্‌ল, যাবার আগে অজরকে কি একখানা চিঠি

লিখবে। কিন্তু তখুনি তার মনে হোলো—না কারুকে কোনো কথা সে জানাবে না। কেন যে সে এখান থেকে চলে যাচ্ছে সে কথা এক মাত্র সে ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে। তার সে গোপন কথা অন্য কারুর জানবার প্রয়োজনও নাই। ইন্দিরার আজকের কথাগুলো যেমন তার অন্তরের গোপন কক্ষে চিরদিনের মতন রুদ্ধ হোয়ে রইল তেমনি তার এস্থান ত্যাগ করবার কারণও তারই সঙ্গে চিতায় পুড়ে যাবে কেউ জানবে না।

—দশ—

সারারাত্রি চিন্তার পর মস্তিষ্কের অবসাদে শোভনা ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে উঠেই শোভনা চাকরকে ডেকে বল্লে—ধোপাকে গিয়ে বল আজই সন্ধ্যার মধ্যে আমার সমস্ত কাপড় চাই। কাল আমি দেওঘরে যাব।

দেওঘরে চিঠি লিখে দিয়ে সে বাক্স গুছোতে আরম্ভ করলে। চারি বছরের সংসার একদিনে তুলে নিয়ে যেতে হবে। কোথায় কি পড়ে আছে তার ঠিকানা নেই। তার কত বই কতজনে পড়তে নিয়ে গেছে, কত জন তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে, কত জনে তার কাছে টাকা পাবে। কিন্তু এক দিনের মধ্যে সে সব দেনা পাওনার হিসাব মিটবে না। সে সবের ব্যবস্থা না কোরেই সরে পড়তে হবে। সেখানে গিয়ে চিঠি লিখে সব মেটানো যাবে। শোভনার মাথার মধ্যে যেন ঝড় বইছিল। তার একবার মনে হোল সমর বাবুকে ডেকে এখুনি চাকরী ছাড়ার কথা জানিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ ছুটির মধ্যে তারা লোক যোগাড় করে নিতে পারবে। তাড়াতাড়ি সমরকে একখানা চিঠি লিখে সে জানালার ধারে গিয়ে দারোয়ানকে ডাক দিলে। কিন্তু জানালা থেকে ফিরে এসেই তার মনে হলো সমর যদি তাকে চাকরী ছাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে কি উত্তর দিবে? নিশ্চয় সমর একটা কিছু সন্দেহ করবে। যাক্‌গে সেখানে গিয়েই সে ত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেবে।

দারোয়ান এসে দাঁড়াল। শোভনা একটু ভেবে তাকে বল্লে—একবার ষ্টেশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরে এস যে দেওঘরে যাবার গাড়ী কখন পাওয়া যাবে।

দারোয়ান চলে গেল। কিছুক্ষণ বাক্স গোছাবার পর শোভনা ক্লান্ত হোয়ে আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিলে। কাল সারারাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কেটেছে; মনের অবসাদ ও দেহের ক্লান্তিতে শরীর তার ভেঙ্গে পড়্‌ছিল। সে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সামান্য কিছু খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল।

দারোয়ান এসে খবর দিলে যে দিনের বেলায় নটার সময় একটা গাড়ী আছে সেটা গিয়ে সন্ধ্যের সময় যশিডিতে পৌছায়, আর রাত্রি আটটায় একটা ছাড়ে সেটা গিয়ে পৌছায় শেষ রাত্রে।

শোভনা স্থির করলে সে দিনের গাড়ীতেই যাবে। তারপরে রেলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়্‌ল।

শোভনার যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। দেহের ক্লান্তি দূর হয়েছে বটে কিন্তু মনের মধ্যে কি যেন একটা গুরুভার চেপে রয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই সে ভাবতে লাগল আর কোন কাজ বাকী আছে কিনা। ঘরের জানালাগুলোয় সে নিজের হাতে তৈরী করা সুন্দর পর্দা লাগিয়েছিল। সেগুলোর দিকে চোখ পড়তেই তার মনে হোলো পর্দাগুলো খুলে নিয়ে যেতে হবে। একটু পরেই আবার তার মনে হোতে লাগল না থাক, এঘরে তবুও তার কিছু চিহ্ন থাক।

টেবিলের ওপরে চোখ পড়তেই শোভনা দেখলে খান তিনেক মাসিক পত্র ডাকে এসেছে। সে ভাবলে, কাল দুপুরটা রেলে তবুও খানিকটা সময় কাগজ নিয়ে কাটানো যাবে। বিছানা থেকে উঠে একখানা কাগজ নিয়ে আবার এসে সে শুয়ে পড়্‌ল।

কাগজখানার মোড়ক ছিঁড়ে পাতা উল্টেই শোভনা দেখলে প্রথমেই

একজনের ছবি দেওয়া হয়েছে। ছবিটার নীচে লেখা—কবি শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ছবি দেখেই শোভনা বুঝতে পারলে, এতো তাদেরই সেই রমেশ! তা হোলে তো তার অনুমান ভুল হয় নি। রমেশ যেন আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে। তখনো রমেশের চেহারা সুন্দর ছিল কিন্তু এখনকার চেহারার মধ্যে বেশ একটা গাম্ভীর্য্য এসেছে; এই গাম্ভীর্য্য তাকে বেশ সুন্দর কোরে তুলেছে।

তার মনে হোতে লাগ্‌ল আজ তার ভাগ্যগগনে যখন পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ ঘনীভূত হোয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়ে রমেশের সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হোলো। তাদের দু-জনের ভাগ্যসূত্র এইভাবেই গ্রথিত হয়েছে। তবুও এই রমেশকে ছেলেবেলায় সে ভালবেসেছিল। তারই কল্পনায় রমেশের এই সৌভাগ্যের ছবি সবার আগে প্রতিভাত হয়েছিল। তাকে উপলক্ষ্য কোরেই তো তার কবিত্ব শক্তি স্ফুরিত হয়েছিল। আজ কোথায় সে আর কোথায় রমেশ! শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল রমেশের এই সৌভাগ্যের দিনে তার কি চুপ কোরে থাকা উচিত হবে! সে ঠিক করলে চিঠি লিখে রমেশকে আনন্দ জ্ঞাপন করবে। শোভনা উঠে কাগজ কলম এনে চিঠি লিখতে বস্‌ল।

শোভনা লিখলে। রমেশ দা—আজ কাগজে দেখলুম, কলকাতায় সমারোহ কোরে তোমার অভিনন্দন দেওয়া হয়েছে। খবরটা পড়ে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তোমার কবিত্ব শক্তির পরিচয় আমিই প্রথমে পাই, সে কথা বোধ হয় তোমার এখন মনে নেই। তোমার কবিতা এখনো আমি সমান আগ্রহে পড়ি। এই সুযোগে আমি তোমাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতি—

শ্রীশোভনা চট্টোপাধ্যায়

খামের ওপরে বার লাইব্রেরী ঠিকানা লিখে দরোয়ানকে ডেকে শোভনা বল্লে—এক্ষুণি ষ্টেশনে গিয়ে এই চিঠিখানা ফেলে দিয়ে এস। আজই এটা যাওয়া চাই।

দারোয়ান 'যো হুকুম' বলে চিঠি নিয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুট্‌ল।

দারোয়ান চলে যাবার পর শোভনা আবার পত্রিকাখানা খুলে বস্‌ল। রমেশের ছবিখানা দেখে দেখে যেন তাঁর আশ মিটছিল না। ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে তার খালি মনে হোতে লাগ্‌ল—এই সেই রমেশ!

শোভনা ভাবতে লাগ্‌ল যে রমেশ তার চিঠি পেয়ে কি মনে করবে! হয়ত তার কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছে। হয়ত বিয়ে টিয়ে কোরে সংসারের চক্রে সে এমন জড়িয়ে পড়েছে যে পুরোনো দিনের সে সব কথা মনে করবার অবসরই তার নেই। শোভনা আবার রমেশের সম্বর্দ্ধনার বিবরণ আগাগোড়া পড়ে গেল। একবার তার মনে হোলো রমেশ হয়তো তার চিঠি পেয়ে মনে করবে, এতদিন বাদে সে তাদের সেই পুরানো স্মৃতি জাগিয়ে তোলবার জন্যই এই আনন্দ জ্ঞাপনের অভিনয় করেছে। কিন্তু সে তো চিঠিতে কোনো কথাই লেখেনি। তার কথা কি রমেশের মনে আছে? সে স্থির করলে, আপাততঃ দেওঘরে যাওয়া স্থগিত রেখে রমেশের চিঠির জন্য দিনকতক অপেক্ষা করবে।

পত্রিকাখানায় সে মাসে কল্পনাদেবীরও একটা বড় কবিতা বেরিয়েছিল। শোভনা নিজের কবিতাটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে।

কবিতাটা একবার, দুবার, তিনবার পড়ে সে বইখানা বন্ধ কোরে রাখলে। তার মনে হোতে লাগ্‌ল হয়ত লোকে তারও একদিন সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করবে। কল্পনার চোখে সে দেখতে লাগ্‌ল যেন বিরাট সভা-ক্ষেত্রের মাঝে একটি বেদীতে তাকে বসান হয়েছে। পাশে একজন

দাঁড়িয়ে অভিনন্দন-লিপি পড়ছে। অভিনন্দনের উত্তরে সে কি বল্‌বে তাই সে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগ্‌ল। এক জায়গায় একটা কথা আট্‌কে যেতেই তার চমক ফিরে এল। নিজের ছেলেমানুষীতে সে নিজেই হেসে ফেল্লে।

ঝি এসে খাবার কথা জানাতে শোভনা খেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল।

শুয়ে শুয়ে সে হিসাব করতে লাগ্‌ল—আজ রাতে যদি চিঠিখানা না যায় তা হোলে কাল বেলা দশটার মধ্যে সেখানা কলকাতায় যাবেই। রমেশের কাছে চিঠি পৌঁছতে সেই তিনটে কি চারটে। সেই দিনই সে যদি জবাব দেয় তা হোলে পরশু সে চিঠি পাওয়া যাবে। কিন্তু চিঠি পেয়েই কি রমেশ জবাব দেবে? সে কাজের লোক, হয়তো দু-তিন দিন পরে উত্তর দেবে। যা হোক্, রমেশ যদি উত্তর দেয় তা হোলে আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই সে তা পাবে। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল আজ থেকে সাত দিনের মধ্যেই তার জীবনের ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দিষ্ট হোয়ে যাবে। তারপর নানারকম সম্ভব ও অসম্ভব চিন্তা একটার পর একটা এসে তার মনের দরজায় ভিড় কোরে দাঁড়াতে লাগল। কত প্রশ্নের সমাধান হোয়ে গেল, কত প্রশ্নের সমাধান হবার আগেই অন্য প্রশ্ন জোর কোরে ঢুকে পড়্‌ল। সুখ দুঃখ, ভয় বিস্ময়, আশা নিরাশার দোলায় দোল খেতে খেতে সে বিপর্য্যস্ত হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এরি মধ্যে কখন্ সুষুপ্তি এসে তার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে শোভনার মনের মেঘ অনেকখানি কেটে গেল। প্রবল ঝড় বৃষ্টির পরে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয় তার মনের অবস্থাও বর্ষণ ক্লান্ত প্রকৃতির মত শান্ত হোয়ে পড়েছিল। শোভনার

মনে পড়্‌ল, কাল ইন্দিরা কলকাতায় চলে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়্‌ল, ইন্দিরার সেই কথা—আর বোধ হয় আমি কলকাতায় যাব না।

ইন্দিরার এই কথার রহস্য সে সেদিনও বুঝতে পারে নি, আজও বুঝতে পারলে না।

দুপুরবেলা সে দেওঘরে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে যে, বিশেষ একটা কাজের জন্য আজ তার দেওঘরে যাওয়া হোলো না। কয়েকদিন পরে যাবে। যাবার আগে সে চিঠি লিখে জানাবে।

ইন্দিরার কথা বারবার ঘুরে ঘুরে তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো। ইন্দিরা কল্‌কাতায় গেছে—শোভনার ইচ্ছে হতে লাগ্‌ল একবার অজরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। সেই কলকাতায় যাওয়ার পর থেকে অজরের বাড়ীতে তার যাওয়া অনেক কমে গিয়েছিল। শোভনা ভাবতে লাগ্‌ল অজর না জানি আজকাল তাকে কি মনে করে। দু-তিনবার মনকে প্রস্তুত কোরেও সে অজরের কাছে যেতে পারলে না। সে স্থির করলে, দেওঘরে যদি যেতেই হয় তা হোলে যাবার আগে অজরকে একখানা চিঠি দিয়ে যাবে। অজরকে কি লিখবে শোভনা বসে বসে তারই একখানা খস্‌ড়া করতে লাগল।

একমেটে রকমের একটা খস্‌ড়া কোরে একখানা মাসিক পত্র নিয়ে শোভনা জানালার ধারে গিয়ে বস্‌ল।

পরদিন বেলা দশটার সময় কলকাতার ডাকে রমেশের কাছ থেকে শোভনার চিঠির উত্তর এল। রমেশ লিখেছে—

শোভনা—

এতদিন পরে হঠাৎ তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি! আমার সেদিনকার সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্য হোয়ে

এতদিন পরে যে তোমার সঙ্গে যোগ স্থাপিত করলে এ জন্য সম্বর্দ্ধনার উদ্যোক্তাদের আমি আজ মনে প্রাণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তুমি কলকাতার এত কাছে থাক, কখনো কি এখানে আস না? যদি আস তা হোলে দেখা না কোরে যেও না। আশা করি ভাল আছ। ইতি—

রমেশ

চিঠিখানা পড়তে আনন্দে শোভনার চোখে জল এসে গেল। সে হিসাব কোরে দেখলে যে রমেশ তার চিঠি পেয়ে এক দিনও দেরী করেনি। শোভনা তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে রমেশের চিঠির উত্তর দিতে বস্‌ল।

রমেশ দা—

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। এত শীগ্‌গীর যে জবাব পাব এ আশা করিনি। তোমার বাড়ীর ঠিকানাটি কি? তাড়াতাড়িতে সেটা লিখতে ভুলে গিয়েছ। ভাল কথা, কাল আমি কলকাতায় যাচ্ছি। বেলা একটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত আমি মিউজিয়মের একতলায় প্রত্ন বিভাগের ঘরে থাকব। তোমরা এখন কোথায় থাক জানি না। তা হোলে সেখানে গিয়েই দেখা করতুম। আশা করি ভাল আছ। ইতি—

শোভনা

রমেশকে চিঠি লেখা শেষ কোরে শোভনা ইন্দিরার সেই হোটেলে চিঠি লিখে জানাল যে কাল এগারোটা থেকে যেন তার জন্য একখানা ঘর ঠিক থাকে। সে সাত দিন থাকবে।

চিঠি দুখানা ডাকঘরে ফেলতে পাঠিয়ে দিয়ে শোভনা তার কাপড়ের বাক্স খুল্লে। বাক্স থেকে কতকগুলো ভাল শাড়ী ও ব্লাউজ বার করে একটা ছোট সুটকেশে পুরলে। কতকগুলো গয়না একটা রুমালে বেঁধে বাক্সের এক কোণে রেখে বাক্সটা বন্ধ করলে।

সে দিনটা শোভনার আর যেন কাটতে চায় না। অনেক কষ্টে বিকেল অবধি ঘরের মধ্যে ছটফট্ কোরে শেষকালে সে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ী থেকে বেরিয়েই তার মনে হোলো অজরের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। এই দু দিনে শোভনার মনে যে সংসারের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া অভিমান ঘনিয়ে উঠেছিল, রমেশের চিঠি পেয়ে তার মনের সে অভিমান দূর হোয়ে গিয়েছিলো। কল্পনায় সে অদূর ভবিষ্যতের রঙিন ছবি তৈরি করছিল এখানকার এই সব ক্ষুদ্রতার সেখানে কোনো স্থান নেই। রমেশ যদি তাকে গ্রহণ করে তা হোলে তো কথাই নাই। আর ভবিতব্য যদি তার অদৃষ্টে অন্য কথা লিখে থাকে তা হোলে সে দেওঘরে চলে যাবে। অজর তো তার কোন অনিষ্টই করে নি।

অজরের বাড়ীতে গিয়ে শোভনা দেখলে যে সে একখানা ইংরেজী বই পড়্ছে। সে বল্লে—পণ্ডিত মশাই যে অনেকখানি উন্নতি করেছেন দেখচি!

অজর বইখানা মুড়ে রেখে বল্লে—তোমরা তো আর আমায় পড়ালে না।

শোভনা হাস্তে হাস্তে বল্লে—যা পড়ান পড়েছিলেন তাতে তো আমাদের ভয় হয়েছিল। উঠেছেন এই আমাদের ভাগ্যি। এখন কেমন আছেন পণ্ডিত মশাই?

অজর বল্লে—এখন তো ভালই আছি। আচ্ছা শোভনা! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তুমি আমায় পণ্ডিত মশাই বল কেন?

শোভনা বল্লে—তবে কি বলব?

অজর বল্লে—কেন দাদা বল্তে পার কিংবা যা খুসী বল্তে পার। পণ্ডিত মশাই তো নই আমি।

শোভনা বল্লে—বেশ, দাদাই বল্‌ব। কিন্তু হঠাৎ দাদা বলতে আরম্ভ করলে বৌদি হাঙ্গামা বাধাবে না তো ?

শোভনার চোখে মুখে একটা দুষ্টু হাসি খেলে গেল। অজয় কোনো কথা না বলে শোভনার দিকে চেয়ে রইল।

শোভনা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি দেখছেন অমন কোরে ?

অজয় একটু হেসে বল্লে—তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে শোভনা !

শোভনার মুখখানা লজ্জায় লাল হোয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তখুনি সে বল্লে,—কেন আমি কি কুৎসিত যে অন্য দিন আমায় বিশ্রী দেখায় !

অজয় বল্লে—এমন কথা যে বলে তার চেয়ে বড় মিথ্যেবাদী আর নাই।

শোভনা যেন কিছুই জানে না এম্‌নি একটা ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বৌদি কোথায় ?

অজয়ের হাসি মুখ এক মুহূর্ত্তেই বিষণ্ণ হোয়ে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে কলকাতায় গেছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে অজয় হঠাৎ বলে ফেল্লে—জান শোভনা, ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করছিল আমি তোমায় ভালবাসি কিনা—

শোভনা স্তম্ভিত হওয়ার অভিনয় কোরে অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার ভয় হোতে লাগ্‌ল এক্ষুনি সে হো হো কোরে হেসে ফেলবে ! সে যে অজয়ের চেয়ে অনেক বেশী জানে সে কথা প্রকাশ করবার জন্য তার ভয়ানক ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে সে ইচ্ছাকে রোধ করে সে বসে রইল।

অজয় এবার একটু হেসে বল্লে—আমি ইন্দিরাকে কি বলেছি জান ?

শোভনা বল্লে—কি ?

অজর বল্লে—আমি বলেছি যে তোমায় ভালবাসি।

শোভনা বলে উঠ্‌ল—আঃ কি যে বলেন অজর দা। আমি যাই—বলে শোভনা উঠে পড়্‌ল।

অজর বল্লে—আমিই বোধ হয় তাড়ালুম তোমাকে।

শোভনা আবার বসে বল্লে—আচ্ছা তা হোলে বস্‌ছি। আমায় আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কাল কলকাতায় যাচ্ছি—জিনিষগুলো এখনো গুছোনো হয় নি।

অজর বল্লে—তোমারও কি ইন্দিরার ছোঁয়াচ্‌ লাগ্‌ল নাকি ?

শোভনা আর অজরের দিকে চাইতে পারলে না। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটাবার পর অজর জিজ্ঞাসা করলে—কবে ফিরবে ?

শোভনা বল্লে—চার পাঁচ দিন বাদে ফিরব।

অজর বল্লে—এতদিন !

শোভনা একটু ম্লান হেসে বল্লে—কলকাতা থেকে এসে হয়ত চির দিনের জন্যই এ জায়গা আমাকে ছাড়তে হবে।

কথাটা বলেই শোভনার চোখ ছল ছল করতে লাগ্‌ল। অজর অবাক হোয়ে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—কেন শোভনা, এখানে কি তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে ?

শোভনা বল্লে—না এখানে অসুবিধা কিছু নেই। বরং এর চেয়ে সুবিধার চাকরী অন্য কোথাও জুটবে কি না জানি না। তবুও আমায় যেতে হবে, অন্য কারণ আছে।

অজর কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু কোরে রইল। তার

পরে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা আমার কোনো ব্যবহারের জন্য কি তুমি চলে যাচ্ছ ?

শোভনার দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর কোরে অশ্রু ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল। অজর তার একখানা হাত তুলে নিয়ে বল্লে—তোমার কি দুঃখ আমাকে জানাবে না ? কি জন্য এখান থেকে তুমি চলে যাচ্ছ তার কারণ।

শোভনা বলে উঠল—তার কারণ নিশ্চয়ই আপনাকে জানাব। আপনার চেয়ে বড় বন্ধু আমার আর কেউ নেই। কিন্তু এখন নয়—এখন নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—বৌদি কবে ফির্‌বেন ?

অজর উদাসভাবে বল্লে—সে কি কখনো বলে যায় কবে ফিরবে !

শোভনা বল্লে—একটা কথা আপনাকে বলতে পারি যদি কারুকে না বলেন।

অজর উৎসাহিত হোয়ে বল্লে—কি কথা শুনি ?

শোভনা একটু লজ্জিতভাবে বল্লে—কাউকে বল্‌বেন না বলুন। বৌদিকেও না।

অজর বল্লে—আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করচি কাউকে বল্‌ব না।

শোভনা ধীরে ধীরে বল্লে—বৌদি আর কলকাতায় যাবেন না।

সন্দেহ মিশ্রিত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ শোভনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অজর জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি কোরে জান্‌লে ?

—আমি জান্‌তে পেরেছি।

কথাটা শেষ কোরেই শোভনা উঠে বল্লে—আচ্ছা আমি যাই অজর দা —বলেই সে অজর কোনো প্রশ্ন করবার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

অজয়ের বাড়ী থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে শোভনা শুয়ে পড়্‌ল। ছোট্ট মেয়ে পরের দিন সকালবেলা ভাল পুতুল পাবে শুনে যেমন আশা ও উৎকণ্ঠা জড়িত মনে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে, শোভনাও তেমনি আশা ও উৎকণ্ঠার দোলায় দোল খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

—এগার—

পরের দিন ভোর হবার অনেক আগেই শোভনার ঘুম ভেঙে গেল। সে বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে ছাতে এসে দাঁড়াল। পূর্ব্বগগন তখনো অন্ধকার। কোনো কোনো গাছে এক একটা পাখী আসন্ন উষার আগমনী গাইতে আরম্ভ করেছে মাত্র। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে শোভনার মন-প্রাণ জুড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল আজ তার জীবনের সন্ধিক্ষণ। সে দু-হাত জুড়ে কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—হে আমার ভাগ্য বিধাতা, আজকের দিনটা আমার জীবনে সার্থক কর। গত কয় বছরের সমস্ত দুঃখ ও গ্লানি যেন আজকের আনন্দ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারি। আজকের মুহূর্ত্তগুলো যেন ভবিষ্যৎ জীবনে আমার অভিজ্ঞান হোয়ে থাকে।

ঘরের ভেতর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে সে বসে পড়্‌ল।

রোদ উঠে যাওয়ার পর শোভনা ছাত থেকে উঠে গিয়ে স্নান সেরে এল। তারপরে চা খেয়ে দারোয়ানকে ডেকে তার হাতে বাক্সটা দিয়ে বল্লে—আমায় একটু ষ্টেশনে পৌছে দিতে হবে।

শোভনা ষ্টেশনে এসে দেখলে ট্রেণ আস্‌তে তখনো আধ ঘণ্টা দেরী আছে। একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে সে একদিকের একখানা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়্‌ল। কলকাতা-যাত্রী ট্রেণখানা আসতে সে একখানা খালি কামরায় উঠে দারোয়ানকে বিদায় দিলে।

ট্রেণ ছুটতে লাগ্‌ল। শোভনার মনের মধ্যে ট্রেণের চেয়ে দ্রুত চিন্তার ঝড় বইতে লাগ্‌ল। আশা, আনন্দ ও নিরাশার নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে সে কলকাতায় গিয়ে পৌছল।

শোভনা গাড়ী থেকে নেমে একটা মুটের মাথায় তার বাক্সটা তুলে দিয়ে প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় সামনেই ইন্দিরাকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ইন্দিরাও তাকে দেখে দাঁড়িয়েছিল। সে আস্তে আস্তে শোভনাকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি এখানে!

শোভনা প্রথমটা তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারলে না। সে আগের মতনই চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্দিরা তার একখানা হাত ধরে বল্লে—চলুন ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বসা যাক।

বিনা বাক্যব্যয়ে শোভনা ইন্দিরার সঙ্গে ওয়েটিং-রুমে গিয়ে ঢুকল। ইন্দিরা বল্লে—সাড়ে এগারোটার সময় একখানা ট্রেণ আছে সেইটেতে ফিরব, ততক্ষণ ওয়েটিং-রুমে বসে থাকি। কিন্তু আপনি না দেওঘরে যাচ্ছিলেন?

শোভনা বল্লে—দেওঘরে যাবারই তো সব ঠিক ছিল। কিন্তু——আপনাকে বলি—আমি ছেলেবেলায় একজনকে ভালবাসতুম—কাল তার চিঠি পেলুম। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

শোভনার কথা শুনে ইন্দিরা পরম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শোভনা বল্লে—সে-ও আমায় ভালবাসত কিন্তু তার বাড়ীর অমতের জন্য তখন আমাদের বিয়ে হয়নি।

ইন্দিরা এবার অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অতি ধীরে ধীরে বল্লে—পুরুষকে কখনো বিশ্বাস করবেন না।

ইন্দিরাকে প্রথম শোভনার আশ্চর্য্য নারী বলে মনে হয়েছিল। তার

পরে তার সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হোতে লাগ্‌ল, ইন্দিরার রহস্য যেন তত গাঢ়তর হোয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু ইন্দিরার আজকের এই উক্তি শোভনার সকল বিস্ময়কে ছাড়িয়ে উঠ্‌ল। সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বল্লে—আচ্ছা আমি যাই, মুটেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইন্দিরা কোনো কথা না বলে দু-হাত তুলে তাকে নমস্কার করলে।

শোভনা তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের বাইরে এসে একখানা ট্যাক্সি কোরে হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হোলো। হোটেলের মালিক এক শ্বেতাঙ্গী রমণী। বয়সে সে বৃদ্ধা কিন্তু যৌবন যে তার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে এ বয়সেও তার চিহ্ন বর্ত্তমান। শোভনার জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৃদ্ধা তাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল।

শোভনা তাকে বল্লে—ঘরেই আমার খাবার দিয়ে যেতে বলুন—আমি এখুনি বেরুব।

বৃদ্ধা চলে যাবার কিছু পরেই চাকরে খাবার নিয়ে এল। খাওয়া শেষ কোরে সে ঘড়ি দেখলে বারোটা বেজে গেছে। সে তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে মিউজিয়ামের দিকে রওনা হোলো।

মিউজিয়ামে প্রত্নবিভাগের ঘরে ঢুকে শোভনা একটা পাথরের ভাঙা মূর্ত্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তখনো সে সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছিল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল হয়ত রমেশ তার চিঠি পায়নি, কিংবা হয়ত এ সময় তার আসবার সুবিধা হবে না।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি কোরে শোভনা হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে দেড়টা বেজে গেছে। তার মনে হোতে লাগ্‌ল রমেশ বুঝি আর এল না। রমেশকে সে যা লিখেছিল মনে মনে সেই কথাগুলো আবৃত্তি

কোরে যেতে লাগ্‌ল। সে লিখেছিল যে একটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত সেই ঘরে থাকবে। এখনো তা হোলে আধ ঘণ্টা সময় আছে। শোভনার মনে হোলো সময়টা আর একটু আগিয়ে দিলেই ভাল হোতো।

হঠাৎ তাকে চম্‌কে দিয়ে একদল মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক ও পুরুষ হৈ হৈ কর্‌তে কর্‌তে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। শোভনা ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে দেখছে এমন সময় কে যেন তাকে আহ্বান কর্‌লে—শোভনা না?

শোভনা মুখ ফিরিয়ে দেখলে আপাদমস্তক সাহেবী পোষাকে ঢাকা রমেশ দাঁড়িয়ে।

রমেশ একেবারে তার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবেগ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছ শোভনা?

শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল যেন এক্ষুনি সে টলে পড়ে যাবে। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বল্লে—ভাল আছি।

রমেশ বল্লে—আমার বোধ হয় আসতে একটু দেরী হোয়ে গিয়েছে। আমি একটা কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম এমন সময় চাপরাশী তোমার চিঠিখানা এনে দিলে। চিঠি পেয়েই সোজা চলে এসেছি।

রমেশের কথা শুনে শোভনা একটু হাসলে মাত্র। সে কোনো উত্তর দিতে পারলে না।

তারা দুজনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। রমেশ জিজ্ঞাসা করলে—তারপর প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা হচ্ছে কতদিন থেকে?

শোভনা বল্লে—চর্চ্চা ঠিক নয়। তবে আমার বড় ভাল লাগে এই পুরাণো মূর্ত্তিগুলি।

চলতে চলতে তারা একটী অমিতাভ বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে এসে দাঁড়াল। রমেশ সে মূর্ত্তির সৃষ্টিকাল, তার ইতিহাস ও তার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ কোরে দিলে।

কথা বলতে বলতে একবার পকেট থেকে ঘড়ি বার কোরে দেখে রমেশ বল্লে—শোভনা আমায় এক্ষুণি একটা জরুরী কাজে যেতে হবে। তুমি কোথায় আছ ?

শোভনা রমেশকে তার হোটেলের ঠিকানা বল্লে।

রমেশ বল্লে—সন্ধ্যের পরে তোমার কোনো কাজ নেই তো ?

শোভনা বল্লে—না।

রমেশ বল্লে—তা হোলে সাড়ে সাতটার সময় আমি তোমার ওখানে যাব। কোনো একটা হোটেলে গিয়ে দুজনে নিরিবিলিতে কথাবার্ত্তা বলা যাবে, কি বল ?

শোভনা বল্লে—অন্য হোটেলে যাবার কি দরকার, আমি যেখানে আছি—

রমেশ বলে উঠ্‌ল—দূর পাগল—। আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। সাড়ে সাতটা—মনে থাক্‌বে ?

শোভনা ঘাড় নাড়তেই রমেশ হন্ হন্ কোরে বেরিয়ে চলে গেল।

রমেশ চলে যাবার মিনিট পনেরো পরেই শোভনা মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এল। সকাল থেকে ছুটো-ছুটি কোরে সে ক্লান্ত হোয়ে পড়েছিল। পাখা খুলে দিয়ে সে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

শোভনার যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন ছটা বেজে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে সে প্রসাধনে মন দিলে। মাথায় এলো খোঁপা বেঁধে কপালের মাঝে একটি ছোট্ট সিঁদূরের টিপ দিলে। হাল্‌কা সবুজ রংয়ের পাতলা রেশমের শাড়ী ও তার সঙ্গে মিলিয়ে একটি ব্লাউজ পরলে। স্কুলে সে পুরো হাত ব্লাউজ পর্‌ত কিন্তু ইন্দিরার দেখা দেখি সে সমস্তটা হাত খোলা ব্লাউজ তৈরী করিয়েছিল, এত দিন তা পরা হয়নি। ব্লাউজটা পরে

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার লজ্জা হোতে লাগ্‌ল। হাতের চুড়িগুলো খুলে ফেলে সে দু-গাছা সরু গোল বালা পরলে। তার মা মারা যাবার আগে তার জন্য হাল ফ্যাসানের গোল তাগা তৈরি করিয়েছিলেন—এতদিন শোভনা সে তাগা ব্যবহার করেনি। একগাছা তাগা বের কোরে সে বাঁ হাতের বাহুতে পরলে। তাগা পরবার সময় শোভনা বুঝতে পারলে এত দুঃখেও সে আগের চেয়ে অনেক মোটা হোয়ে পড়েছে, কারণ তাগা যখন তৈরি হয় তখন সেগুলো তার বাহুর চাইতে বড়ই ছিল। তার সুগোল গৌর হাতে সে তাগা এঁটে বসে রইল।

বেশ বিন্যাস শেষ কোরে সে লম্বা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে শোভনার মনে হোলো—যৌবন এখনো তার দেহ থেকে বিদায় নেয় নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সজ্জার মধ্যে কোথায় কি খুঁৎ আছে তাই আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

সাতটা বাজবার কয়েক মিনিট পরেই হোটেলের বেয়ারা রমেশের কার্ড নিয়ে এসে শোভনাকে দিয়ে বল্লে—সাহেব অপেক্ষা করছেন।

শোভনা কার্ড পড়ে বল্লে—সাহেবকে সেলাম দাও।

বেয়ারাকে বিদায় কোরে আর একবার সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চট কোরে নিজেকে দেখে নিয়ে ফিরে এসে একখানা চেয়ারে বসে পড়্‌ল।

রমেশ ঘরে ঢুকেই বল্লে—এই যে শোভনা, একেবারে তৈরি।

রমেশ ডিনারের পোষাক পরে এসেছিল। শোভনা অবাক হোয়ে তার অপরূপ পোষাক দেখতে লাগ্‌ল।

রমেশ বল্লে—শোভনা, ডিনারের এখনো দেরী আছে। চল ততক্ষণ আমরা মোটরে কোরে একটু বেড়িয়ে নিই।

রমেশের আহ্বানে শোভনা উঠ্‌ল না, সে যেমন বসেছিল তেমনিই

বসে রইল। প্রথম থেকেই রমেশের ব্যবহারের মধ্যে সে কি যেন একটা অভাব বোধ করছিল। সেই অভাবটা এবার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হোয়ে তার অন্তরে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করতে আরম্ভ কোরে দিল। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল কে যেন তার হাত ধরে কোন এক বন্ধুর পথে ছুটে চলেছে। যে তাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করছে তাকে সে চেনে না, যে পথে সে পা বাড়িয়েছে সে পথও তার অজ্ঞাত। এতক্ষণ যে উৎসাহে সে বেশ বিন্যাস করছিল, হঠাৎ কে যেন তার সমস্ত উৎসাহ শুষে নিয়ে চলে গেল।

শোভনাকে চুপ কোরে থাকতে দেখে রমেশ এগিয়ে এসে তার একখানা হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে তোমার শোভনা! অসুখ করচে?

শোভনার বুকের মধ্যে কান্না গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু পাছে রমেশ তার চোখে অশ্রু দেখে এই ভয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে—না চল।

রমেশ ও শোভনা নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। দরজার সামনেই রমেশের প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। রমেশ এগিয়ে এসে মোটরের দরজা খুলে শোভনাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিজে তার পাশে বসে শোফারকে বল্লে—চল ময়দান।

একটু পরেই মোটরখানা মাঠের আঁকা বাঁকা রাস্তায় পড়ে ছুটতে লাগ্‌ল। রাতের কলকাতার এ মূর্ত্তি শোভনা কখনো চোখে দেখে নি। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দূরে সারি সারি আলোর থাম দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা মোটর তাদের পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। শোভনার দমে-যাওয়া মনটা আবার একটু একটু কোরে চাঙ্গা হোয়ে উঠতে আরম্ভ করলে।

রমেশ জিজ্ঞাসা করলে—শোভনা রাত্রে কখন খাও?

শোভনা বল্লে—আমি আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই খেয়ে নিই।

রমেশ ঘড়ি খুলে দেখে বল্লে—তা হোলে তো তোমার খাবার সময় হয়েছে।

সে শোফারকে বল্লে—হোটেল চলো।

শোফার গাড়ী ঘুরিয়ে বড় রাস্তায় এনে ফেল্লে। বড় রাস্তা দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হোয়ে গাড়ী এক হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। রমেশ দরজা খুলে নেমে হাত ধরে শোভনাকে নামালে। তার পরে একটা হাত দিয়ে শোভনার বাহু বেষ্টন কোরে তাকে নিয়ে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

শোভনা এ দৃশ্য কখনো দেখেনি। প্রকাণ্ড ঘর, বিজলীর বাতিতে ঘরটায় একবোরে দিনের আলোর মতন আলো! শতাধিক পাখা এক সঙ্গে বোঁ বোঁ কোরে ঘুরছে। সারি সারি ছোট ছোট গোল টেবিল পাতা। টেবিল ঘিরে বর্ণহীন নর-নারীদের পানাহার চলেছে। দু-একটা টেবিলে দেশী লোকও বসেছে। রমেশ এর মধ্যে দিয়ে শোভনাকে নিয়ে অগ্রসর হোতে লাগল।

বড় ঘর পেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে একটা সরু রাস্তা দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হোয়ে তারা একটা কাটা দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজার সামনেই হোটেলের একজন চাকর দাঁড়িয়েছিল, সে তাদের সেলাম কোরে এক হাতে ঠেলে দরজাটা খুলে দিলে। রমেশ তাকে কি একটা কথা বলে শোভনাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্র কিছুই নেই। সামনেই একটা কাঁচের কাটা দরজা। ও পাশের ঘরের তীব্র আলো সেই দরজার ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে এ ঘরে এসে পড়েছে। রমেশ অগ্রসর হোয়ে সেই দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে বল্লে—এস শোভনা।

শোভনা সেই ঘরের মধ্যে ঢুকল। এ ঘরে একটা সুন্দর টেবিলের ওপরে ধপ্ধপে শাদা কাপড় পাতা। দু-দিকে দু-খানা চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে একটা ফুলদানী—তাতে গুটি কয়েক মরশুমী ফুল। চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপরে রূপোর মতন ঝক্‌ঝকে কাঁটা চামচ ইত্যাদি সাজান।

রমেশ শোভনাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বল্লে—বোসো আমি এক মিনিটের মধ্যেই আস্‌চি।

রমেশ বেরিয়ে গেল। শোভনা চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগ্‌ল। এত সমারোহ সে জন্মে কখনো দেখেনি। এমন জায়গায় খেতে এসেছে বলে মনে মনে তার একটু গর্ব্বও হোতে লাগ্‌ল। একটু পরেই তার সাম্‌নে একটা বড় আয়নার ওপরে তার চোখ পড়্‌ল। সে আস্তে আস্তে উঠে আয়নার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। নিজেকে এত সুন্দরী এর আগে তার আর কখনো মনে হয়-নি। সে সন্তর্পণে কয়েকগাছা চুল কপাল থেকে তুলে মাথার ওপরে গুছিয়ে রাখতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ রমেশ এসে পড়্‌তেই শোভনা একটু অপ্রস্তুত হোয়ে পড়্‌ল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে ভাবটা কাটিয়ে আবার সে যত্ন কোরে চুল সরাতে আরম্ভ কোরে দিলে। রমেশ আস্তে আস্তে তার পেছনে এসে দাঁড়াল। তার পরে পেছন থেকে দু-হাত দিয়ে শোভনার মাথাটা নিজের কাঁধের ওপরে টেনে এনে তার অধরে গভীর চুম্বনের দাগ এঁকে দিলে। শোভনা অসঙ্কোচে তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে।

রমেশ বল্লে—তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে শোভনা।

শোভনা কোনো উত্তর দেবার আগেই সে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে অন্য চেয়ারটায় বসতে বসতে বল্লে—হলে বসতে যদি তোমার অসুবিধা হয় সেইজন্য ঘরের মধ্যে বসবার ব্যবস্থা করলুম। এখানটা বেশ নিরিবিলি।

রমেশের চুম্বনের নেশা তখনো শোভনার কাটেনি। সে বল্লে—এই ভাল হয়েছে। অত লোকের মাঝে আমি তো বসতেই পারতুম না।

রমেশ বল্লে—বাঙালী মেয়েরা হোটেলে এলে সাধারণতঃ ঘরেই বসে।

এই অবধি বলেই সে হাঁক দিলে—বো—ই।

বাইরে থেকে সাড়া এল—আয়া হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে কাটা দরজা ঠেলে একটি বয় ঢুক্‌ল। টেবিলের ওপরে সে একটা ঝক্‌ঝকে রূপোর বাল্‌তি রাখলে। শোভনা দেখলে বালতির মধ্যে বরফে ঠাসা একটা কালো বড় বোতল রয়েছে। বয় শোভনা ও রমেশের সামনে একটা কোরে ছোট কাঁচের গেলাস রেখে বালতি থেকে বোতলটা তুলে তার ছিপি খুল্‌তে আরম্ভ করলে। শোভনা অবাক হোয়ে তার তৎপরতা দেখতে লাগ্‌ল। কর্ক স্ক্রুটা বসিয়ে এক টানে ছিপিটা খোলা মাত্র হুশ্‌ কোরে খানিকটা ফেনা বোতল থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। তারপরে সে শোভনা ও রমেশের গেলাসে খানিকটা কোরে তরল পদার্থ ঢেলে দিয়ে বোতলটা টেবিলের ওপরে রেখে বাইরে বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে আসবে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা রমেশ দা কল্পনা দেবীর কবিতা পড়েছ?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগে তোমার?

—যতদূর রাবিশ হোতে হয়।

শোভনা একেবারে দমে গেল। সে বল্লে—আমার সঙ্গে তার ভাব আছে। সে কিন্তু তোমার ভারি ভক্ত।

রমেশ আর একটা চুমুক দিয়ে বল্লে—যা লেখে সবই তা বলে রাবিশ নয়। মাঝে মাঝে এক আধটা বেশ হয়।

শোভনা একটু দুষ্টু হাসি হেসে বল্লে—সে কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ভারি ব্যস্ত। আমার মনে হয় সে তোমাকে মনে মনে ভাল-বসে।

রমেশ বলে উঠ্‌ল—বল কি। কবে আলাপ করিয়ে দেবে?

শোভনা তার গেলাসটা তুলে গেলাসের মধ্যে দিয়ে রমেশকে দেখতে লাগ্‌ল।

রমেশ বল্লে—বল না কবে আলাপ করিয়ে দেবে?

—যবে বল্‌বে।

রমেশ বল্লে—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি পরে সে একজন উঁচুদরের লেখিকা হোয়ে উঠবে। একথা তাকে বোলো বুঝলে।

রমেশের হঠাৎ এই মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় শোভনা কৌতুক অনুভব করলে। হাসি চাপতে না পেরে সে হো হো কোরে হেসে উঠ্‌ল। হাসি আর থামে না। শেষ কালে রমেশ তার কাছে গিয়ে বল্লে—চল আমরা ওপরে গিয়ে বসি। তারপরে একটু হাওয়া-টাওয়া খেয়ে ফেরা যাবে।

শোভনা তার হাত দুটো লম্বা কোরে রমেশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—উঠ্‌তে পারচি না যে!

রমেশ তার হাত দু-খানা ধরে তুলতে গিয়ে নিজেই টলে পড়তে শোভনা আবার হো হো কোরে হেসে উঠ্‌ল।

তার পরে এগিয়ে এসে শোভনার হাত দু-খানা ধরে টেনে তুল্লে। শোভনা দাঁড়িয়েই টলে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু রমেশ তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শোভনা ও রমেশ এ-ওর গায়ে টলে পড়্‌তে পড়্‌তে একটা কার্পেট পাতা চাওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠ্‌ল। তারপরে রমেশ তাকে নিয়ে

একটা বড় ঘরে ঢুক্‌ল। ঘরখানার দেওয়ালে লাল রং করা, ওপরে একটা চারভালের বিজলী বাতির ঝাড়। আসবাবের মধ্যে দু-দিকে দুটো বড় সোফা ও কোণে একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। ঘরে তিন চারটে বড় বড় জানালা. সেগুলোতে সুন্দর জালের পর্দ্দা। ঘরের মধ্যে দিয়ে আর একটা ঘর—মাঝের দরজাটা খোলা, তাতে কাটা পরদা ঝুল্‌ছে। ভেতরের ঘরখানা একেবারে অন্ধকার। পর্দ্দার অবকাশ দিয়ে একটা খাটের খানিকটা দেখা যাচ্ছে মাত্র।

শোভনাকে একটা সোফায় বসিয়ে রমেশ দুটো জানলা খুলে দিয়ে এসে ধপাস্ করে তার পাশে বসে পড়্‌ল। তারপর তার একখানা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল যে, রমেশ তাকে ভালবাসে কিনা সেই কথা এইবার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু রমেশ তাকে প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়ে তাকে কঠিন বাহুপাশে জড়িয়ে ধরল। শোভনা কোনো রকমে নিজেকে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত কোরে নিয়ে বল্লে আঃ দেখ দিখিন্ আমার চুল নষ্ট কোরে দিলে!

শোভনা মাথার বিতত চুলগুলোকে ঠিক কর্‌তে কর্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এটা কার ঘর?

রমেশ বল্লে—আমরা দু-জনে সন্ধ্যেবেলা নিরিবিলিতে একটু গল্প করবার জন্য ঘরখানা ঠিক করেছি।

শোভনা বিস্মিত হোয়ে রমেশের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই রমেশ বল্লে—শোভনা, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি, একটা গান গাও।

শোভনার অনেকক্ষণ থেকেই গান গাইবার ইচ্ছা করছিল। রমেশের অনুরোধে সে সোফা থেকে উঠে পিয়ানোর সাম্‌নে গিয়ে বস্‌ল।

গান গাইতে গাইতে পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলো শোভনার মনের মধ্যে একে একে এসে ভিড় জমাতে আরম্ভ করলে। ছাতের কোণে সেই নিরালা কোণটীতে কত জ্যোৎস্নারাতে শোভনা গুণ্ গুণ্ কোরে এই গান রমেশকে শুনিয়েছে। এই ক'বছরের রুদ্ধ অশ্রু সুরের রূপে যেন তার দয়িতের পায়ে সে ঝরিয়ে দিতে লাগ্ল। একবার তার মনে হোলো যেন পিয়ানোটা তার গলার সঙ্গে ঠিক মিল্‌চে না। গানের কথাগুলো যেন সব এলোমেলো হোয়ে যাচ্ছে। তখুনি তার মনে হোলো গলা দিয়ে যেন আওয়াজই বেরুচ্ছে না, তারপরই কে যেন তাকে কোলে কোরে তুলে ফেল্লে। তার একখানা হাত যেন দেওয়ালে না কিসে একটু ঘেঁষ্ড়ে গেল। কে যেন তাকে খাটের ওপরে নরম বিছানায় শুইয়ে দিলে। কার দুটি তপ্ত-ঠোঁট তার অধরে এসে মিল্ল! শোভনার মনে হোতে লাগ্ল কয়েক ঝলক গরম নিঃশ্বাস তার মুখে চোখে পড়তেই তার চমক ভেঙ্গে গেল। তার মনে হোলো যেন একটা অষ্টপদী তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন কোরে রয়েছে। সে কঠিন বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আর কোনো উপায় নেই। চোখ দুটোকে জোর কোরে চেয়ে সে দেখতে পেলে রমেশ তার মুখের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে। সে প্রাণপণ চেষ্টায় রমেশের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত কোরে নিয়ে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে টলতে টলতে বড় ঘরে এসে সোফায় বসে হাঁপাতে লাগ্ল।

রমেশ বড় ঘরে আসতেই শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—আমি কি অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিলুম?

রমেশ আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লে—না!

রমেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লে—চল শোভনা এবার একটু বেড়ান যাক্ গিয়ে—

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কটা বেজেচে?

রমেশ ঘড়ি দেখে বল্লে—এগারোটা বেজে গেছে। রমেশ শোভনাকে সেই রকম কোরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তায় লোকজন তখন একেবারে কমে গেছে। শোভনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে রমেশ তার পাশে বসে বল্লে—চালাও।

হুস্ কোরে একটা তীব্র নিঃশ্বাস ছেড়ে মোটর মাঠের দিকে ছুট্‌ল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা রমেশ দা, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' পড়েচ ?

রমেশ ঘাড় নেড়ে জানালে সে পড়েছে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কেমন লাগ্‌ল তোমার ?

রমেশ চুপ কোরে রইল। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা 'যোগাযোগ' ভাল না 'শেষের কবিতা' ভাল ?

এবার রমেশ বল্লে—শোভনা দোহাই তোমার ? তুমি যে আজকাল খুব সাহিত্যচর্চ্চা করচ তা আমি মেনে নিচ্চি।

রমেশের মুখে এই কথা শুনে শোভনা একেবারে গুম্ হোয়ে গেল। তার বুকের মধ্যে কান্না গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে তার মাথাটা আস্তে আস্তে রমেশের কাঁধের ওপরে রেখে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

রমেশ প্রথমটা গ্রাহ্য করলে না। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলে—কাঁদ্‌চ কেন শোভনা ?

শোভনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে—রমেশদা, তুমি আমায় এখনো ভালবাস ? তোমার দুটী পায়ে পড়ি একবার বল—একবার বল—

রমেশ ব্যস্ত হোয়ে উঠে বল্লে—এই ফ্যাসাদ করলে দেখ্‌চি—

শোভনার কান্নার বেগ বেড়ে উঠ্‌ল। সে বলতে লাগ্‌ল—তোমাকে

যে খুব বিরক্ত করচি তা আমি বুঝতে পারচি রমেশদা—একবার বল তা হোলে আমি কাঁদব না—বল—বল—

রমেশ তার রূঢ়স্বরে একটু আদরের আমেজ মিশিয়ে বল্লে—শোভনা কি করূচ। শোফারটা কি মনে করূচে বল তো ?

রমেশের কথা শুনে শোভনার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। প্রাণ-পণে সে কান্নাটাকে চেপে বল্লে—শোফার কিছু শুনতে পাবে না। তুমি আমার কানে কানে বল—কানে কানে—চুপি চুপি—

শোভনা রমেশের মুখের কাছে কানটা নিয়ে যেতেই রমেশ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—এই রোকো—

মোটরটা থামতেই রমেশ দরজা খুলে বাইরে নেমে পড়্‌ল। শোভনা মুখ বাড়িয়ে দেখলে যে গাড়ী এসে তার হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছে।

রমেশ শোভনার হাত ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তোমায় ওপরে পৌছে দিয়ে আসব—না একলাই যেতে পারবে ?

শোভনার চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন ঘুরছিল। অভিমানরুদ্ধ স্বরে সে বল্লে—না একলাই যেতে পারূব।

রমেশ তার সঙ্গে সঙ্গে দরজা অবধি এগিয়ে এল। শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কাল কখন আসবে ?

রমেশ একটু ঢোঁক গিলে বল্লে—আজ যখন এসেছিলুম।

শোভনা একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—তোমাকে বোধ হয় খুব বিরক্ত করলুম। তুমিই তো—

শোভনার কথা থামিয়ে দিয়ে রমেশ বলে উঠ্‌ল—কিছু না—যাও অনেক রাত হয়েছে।

শোভনা তার হোটেলে ঢুকতেই রমেশ গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল।

সিঁড়িতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে শোভনা রমেশের গাড়ী ছাড়ার শব্দ শুনতে পেলে।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই শোভনা পাখাটা চালিয়ে দিলে। এতক্ষণ ফাঁকায় মোটরে ঘুরে এই ঝুপসি ঘরের মধ্যে তার যেন দম্‌ আটকে আসতে লাগ্‌ল। তেষ্টায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে উঠ্‌ছিল। সে ঢক্‌ ঢক্‌ কোরে এক গেলাস জল খেয়ে সেই অবস্থায় শুয়ে পড়ল।

—বার—

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে শোভনা দেখলে যে তার পায়ে জুতো, হাতে ঘড়ি বাঁধা, বাহুতে তাগা। ঘড়িতে দেখলে এগারোটা বেজে গেছে। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল এ যেন এক নতুন-রাজ্যে প্রবেশ করেছে। সে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ কোরে একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপরে ফিরে এসে মুখ ধুয়ে পোষাক ছেড়ে হোটেলের বয়কে ডেকে বল্লে—দুটোর সময় আমার ঘরে লাঞ্চ দিয়ে যেও।

বয় যো হুকুম বলে সেলাম কোরে চলে যেতেই সে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আবার বিছানায় গা ঢেলে দিলে। গতরাত্রের ঘটনা একে একে তার মনের মধ্যে এসে জমা হোতে লাগ্‌ল যে একলা ওরকমভাবে রমেশের সঙ্গে হোটেলে যাওয়া ভাল হয় নি। কিন্তু তবুও কালকের অভিজ্ঞতা তার মনের মধ্যে পুলকের একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলতে লাগ্‌ল। সে ঠিক করলে, আজ আর সে রমেশের সঙ্গে হোটেলে যাবে না।

শোভনা ভাবতে লাগ্‌ল রমেশ আস্‌বে সেই সন্ধ্যে সাতটায়—এখন বারোটা। রমেশ কি তাকে ভালবাসে? তা হোলে কাল তার সে প্রশ্নের কোনো জবাবই সে দিলে না কেন?

শোভনা ঠিক করলে সন্ধ্যের সময় সেদিন আর কোথাও বেরুবে না, রমেশকে এইখানেই ধরে রাখবে। এই ছোট্ট ঘরটিতে নিবিড় হোয়ে বসে সে তার মনের কথা তাকে বল্‌বে! কি আশায় কি দুঃখে তার জীবনের গত কয় বৎসর কেটেছে। নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত তারই ধ্যানে সে অতিবাহিত করেছে। তারই চিন্তা কবিতার ছন্দে সে ভরিয়ে তুলেছে।

কল্পনা দেবী কে, কোথায় তার কবিতার উৎস—কোন কথা লুকোবে না।

সন্ধ্যা হোয়ে গেল কিন্তু রমেশ এল না, রাত্রির সঙ্গে নিরাশার অন্ধকার শোভনার বুকের মধ্যে ঘনিয়ে উঠতে লাগ্‌ল। ঘড়ির কাঁটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হোয়ে যেতে লাগ্‌ল—রমেশের দেখা নাই। গত রাত্রিতে রমেশের ব্যবহারে শোভনার মনে যে সন্দেহের রেখা পড়েছিল তা ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌ল। শোভনার মনে মধ্যে মধ্যে অনুশোচনার একটা তীব্র জ্বালা জেগে উঠতে লাগ্‌ল। আশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে কিছুতেই সে জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাচ্ছিল না। রাত্রি বারোটা বেজে যাবার পর সে বাতি নিভিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিলে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে শোভনা স্থির করলে আজই সে ফিরে যাবে! কিন্তু তখুনি তার মনে হোলো হয়ত কোনো বিশেষ কাজ পড়ায় কাল রমেশ আসতে পারে নি। আজ সে নিশ্চয়ই আস্‌বে। বেলা এগারটার পর সে হোটেলের একজন চাকরের হাতে রমেশকে বার লাইব্রেরীতে একখানা চিঠি লিখে দিলে।

ঘণ্টা তিনেক বাদে হোটেলের লোক তার চিঠির উত্তর নিয়ে ফিরে এল। রমেশ লিখেছে—

শোভনা,

কাল বিশেষ কাজ পড়ায় তোমার ওখানে যেতে পারি নি। আজ একটা কাজে আমায় কলকাতার বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে যে সময়টুকু আমার কেটেছিল তা অনেকদিন মনে থাকবে। কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে খবর দিলে সুখী হব। ইতি—

রমেশ

রমেশের চিঠি হাতে শোভনা খাটের ওপরে চুপ কোরে বসে রইল। সে

ভাবতে লাগল এই লোককে সে ভালবেসেছিল। এরই ধ্যানে কত দুঃখের দিন তার আনন্দে ভরে উঠেছে। এরই ধ্যানে সে যে কবিতা লিখেছে তারই প্রশংসায় আজ সকলে পঞ্চমুখ।

এই অবহেলা এই প্রত্যাখ্যানের লজ্জায় সে নিজেই অস্থির হোয়ে উঠ্‌ল, নিজের মনের এই ধিক্কারের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সে হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে আরম্ভ কোরে দিলে।

ঘুরে ঘুরে দেহটাকে একেবারে ক্লান্ত কোরে শোভনা যখন হোটেলে ফিরে এল তখন রাত্রি এগারোটা। হোটেলের কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা হোতেই সে বলে দিলে—কাল সকালে আটটায় আমি চলে যাব। তার আগে এসে টাকা কড়ি নিয়ে যেও। ভোর হবার অনেক আগেই শোভনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় পড়ে পড়ে সে ভাবতে লাগ্‌ল দু-দিন আগে এই সময়েই তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কি আকুল আহ্বানে সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সে তার জীবনদেবতার কাছে তার মিনতি জানিয়েছিল। কিন্তু সে চিন্তা মনকে আঁকড়ে ধরবার আগেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে কাপড় চোপড়-গুলো গুছোতে আরম্ভ কোরে দিলে।

—তের—

বেলা প্রায় দশটার সময় শোভনা তার কর্ম্মস্থানে ফিরে এল। ষ্টেশনে একটা মুটের মাথায় তার ছোট বাক্সটা তুলে দিয়ে সে হেঁটেই স্কুলের দিকে রওনা হোলো। পথে চলতে চলতে দু-পাশের গাছ-পালাগুলোর কাছে মনে মনে সে বিদায় নিতে লাগ্‌ল। বিদায়—বিদায় বন্ধু—জীবনের এই কটা বছর এখানে তারা যে তৃপ্তি দিয়েছে তার তুলনা নেই। ছুটি ফুরোবার আগেই তাকে চলে যেতে হবে।

শোভনা বাড়ী পৌঁছে দেখলে স্কুলের লাইব্রেরীতে একদল যুবক বসে আছে। সে ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগ্‌ল—এরা কারা? মেয়ে স্কুলে এত যুবকের সমাগমই বা কেন?

শোভনা ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে মুটেকে বিদায় দিয়ে বসতে না বসতেই তেওয়ারী গিয়ে তাকে খবর দিলে একদল লোক সকাল থেকে তার জন্য বসে আছে। আপনি নেই শুনেও তারা বসে রইল কারণ বেলা এগারটার আগে ফেরবার গাড়ী নেই।

তেওয়ারীর কথা শোভনার বিশ্বাস হোলো না। সে বল্লে—তুমি বোধ হয় ভুল করেছ তেওয়ারী। আমাকে খুঁজেছেন ওঁরা?

তেওয়ারী বল্লে—হাঁ হুজুর আপনার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলেন।

শোভনা আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে গেল।

একদল যুবক ঘরের মধ্যে বসেছিল। শোভনা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই তারা সকলে উঠে তাকে নমস্কার করলে। তারপর একজন অগ্রসর হোয়ে তাকে জানালে যে তারা কলকাতার একটি সাহিত্য সমিতির দূত হোয়ে

তার কাছে এসেছে। তাকে সম্বর্দ্ধনা করবার এক বিরাট আয়োজন তারা করেছে। আগামী রবিবার তার যদি সময় হয় তা হোলে তারা এসে শোভনাকে নিয়ে যাবে।

শোভনা যুবকদের কথার কোনো উত্তর দিতে পারলে না। ব্যাপারটা এত আকস্মিক ও এত অপ্রত্যাশিত যে সে কি বলবে তা বুঝেই উঠতে পারলে না। অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারাই কি রমেশ বাবুকে সম্বর্দ্ধনা করেছিলেন ?

যুবকটী হেসে বল্লে—আজ্ঞে না সে অন্য কোন্ একটা অজ্ঞাতনামা সমিতি। রমেশবাবু সারাজীবন সাহিত্য সাধনা করলেও তাদের মতন অভিজাত সাহিত্য সমিতির সম্বর্দ্ধনা লাভ করতে পারবেন না।

তার কথা শুনে শোভনার হাসি পেল। সে বল্লে—আগামী রবিবার আমি সময় করতে পারব কিনা তা তো এখন বলতে পাচ্ছি না। আপনাদের আমি পরে লিখে জানাব।

যুবকেরা তাকে অনেক অনুনয় কোরে শেষকালে বিদায় গ্রহণ করলে। শোভনা উঠে এসে তার ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগ্‌ল—আকাশ পাতাল চিন্তা। ভাবতে ভাবতে তার রমেশের কথা মনে হোলো। মনে হোলো সেই তাকে জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখ দিয়েছে আবার সেই নিজের অজ্ঞাতে তার মাথায় যশের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। সে না থাকলে, তাকে ভালো না বাসলে সে তো সাহিত্য সাধনায় কখনো মন দিত না। সংসারের দেনা পাওনা এই ভাবেই মেটে বটে।

বিছানা ছেড়ে সে উঠি উঠি মনে করছে এমন সময় ঝড়ের মতন অজয় তার ঘরে ঢুকে পড়তেই সে ধড়মড় কোরে উঠে পড়্‌ল।

অজয়ের চুল রুক্ষ, মুখ শুকনো। শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে অজয় দা।

অজয় বল্লে—ভয়ানক বিপদ—ইন্দিরা বিষ খেয়েছে।

শোভনা চমকে উঠে বল্লে—বিষ খেয়েছেন ? কেন ! কেন !

অজয় বল্লে—সে অনেক কথা। সকাল থেকে সে খালি তোমায় দেখতে চাচ্ছে। দু-বার তোমার কাছে এসেছি, তোমায় পাইনি—

শোভনা অজয়ের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে তাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। যে খাটে অজয় অসুখের সময় শুয়েছিল ইন্দিরা সেই খাটে শুয়ে রয়েছে। তার সিঁদুরের মতন রং একেবারে কালি হোয়ে গিয়েছে। শোভনা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ইন্দিরা তার কম্পমানা একখানা হাত তুলে অজয়ের হাতে দিয়ে ক্লান্ত চোখ দুটোকে বুঁজিয়ে ফেল্লে।

ঘর থেকে শোভনা বেরিয়ে এসে অজয়কে বল্লে—কেন এ কাজ করলেন ?

অজয় পকেট থেকে একখানা চিঠি বার কোরে তার হাতে দিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকল। শোভনা পড়তে লাগ্‌ল—

তোমায় আমি কখনো ভালবাসতে পারিনি—সে জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি যাকে ভাল বাসতুম সে আমায় প্রত্যাখ্যান করায় আমি বিষ খাচ্ছি—তোমার ওপরে কোনো অভিমানে নয়। আমার মৃত্যুর পর শোভনাকে বিয়ে কোরো তোমরা দু-জনেই সুখী হবে—

হতভাগিনী ইন্দিরা

শোভনার চোখের জলের ভেতর দিয়ে ইন্দিরার চিঠিখানা ক্রমে ঝাপসা হোয়ে উঠ্‌ল। চিঠিখানা মুড়ে সে চোখ মুছে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ইন্দিরার প্রাণবায়ু তখন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে।

একটাকা সংস্করণের উপন্যাস

শ্রীরত্নপ্রভা দেবী প্রণীত

পূজারিণী

পূজারিণীর পবিত্রতায় পাপীর অন্তরও
শুভ্র আলোকে বিকশিতপ্রায়

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রাজার ছেলে

বাংলার হিন্দু-রাজত্বের শেষ সময়
অবলম্বনে এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বর-কনে

নায়িকা বিমুগ্ধা তাহার বরের
তেজোগর্ব্বে! এ মিলন চিরন্তনের।

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

আহুতি

নায়িকা তাঁহার সাধ, আশা, বাসনা সমস্ত
জলাঞ্জলি দিয়া আত্মাহুতিতে কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন